وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ আইয়ূব (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'রামাযানের ছিয়াম পালন করার পর কেউ যদি শাওয়াল মাসে ছয় দিন ছিয়াম পালন করে, তবে সে যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; তিরমিযী, হা/৭৫৯; মিশকাত, হা/২০৪৭)।

● ৫ম বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● মে ২০২১
Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٥، رمضان و شوال ١٤٤٢ ه/ مايو ٢٠٢١م العدد:٧، الجزء :٥٥
تصدر عن الجامعة السلفية ببنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

আল-নূর মসজিদ : সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহের বুহায়রা কর্নিশের খালেদ দিঘিতে মসজিদটি অবস্থিত। এটি তুরস্কের উছমানীয় সাম্রাজ্যের স্থাপত্যনকশায় এবং তুরস্কের সুলতান আহমাদ মসজিদের আদলে গড়ে উঠে। ২০১৪ সালে মসজিদটি রামাযান অনুদান প্রকল্পের জন্য 'বিশ্বের বৃহত্তম কাঠের দাতব্য বাক্স' এর জন্য গিনেস বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করে।

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বইসমূহ

মরণ একদিন আসবেই
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮৮ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় লাভবান
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৬০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

রিযিক্ব
লেখক : আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
পৃষ্ঠা : ৯৬ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৮০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?
লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ১৯৬ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী
রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

الاعتصام
Al-Itisam TV
কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!
www.facebook.com/alitisamtv www.youtube.com/c/alitisamtv

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৫ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

মে-২০২১
বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
রামাযান-শাওয়াল
১৪৪২

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- **প্রধান সম্পাদক,**
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- **সম্পাদনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- **ব্যবস্থাপনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- **সার্কুলেশন বিভাগ :** ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- **ই-মেইল :** monthlyalitisam@gmail.com
- **ওয়েবসাইট :** www.al-itisam.com
- **ফেসবুক পেজ :** facebook.com/alitisam2016
- **ইউটিউব :** youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :**
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :**
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- **জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :**
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- **জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :**
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ

» একজন মুমিনের জীবনে কী প্রয়োজন? ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-৯) ০৬
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা ০৮
-মূল : আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী

» তারাবীহর রাকআত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১১
-আহমাদুল্লাহ

» তাক্বদীর নিয়ে কিছু কথা (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৫
-সাঈদুর রহমান

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রামাযান ও ঈদ ১৭
-ওবায়দুল বারী

» ক্বদরের রাত কোনটি ২১
-মাক্বছুদুর রহমান

» ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা ২৭
-সাজ্জাদ সালাদীন

» ঈদের মাসায়েল ৩০
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» শাফাআতের প্রকারভেদ, কারা শাফাআত করবেন এবং তা লাভের মাধ্যমগুলো কী? ৩৩
-অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

◈ তরুণ প্রতিভা

» আল্লাহর ভালোবাস ৩৬
-আবু রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা

» গ্রন্থ পরিচিতি-১০ : ছহীহ মুসলিম ৩৮
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ কবিতা ৪০
◈ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪১
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মে দিবসের ডাক ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

প্রতিবছর মে মাস আসলেই উঠে আসে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের কথা। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটের শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি এবং দৈনিক শ্রমঘণ্টা ১৬ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে। হে মার্কেটের কাছে তাদের বিক্ষোভে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ১০/১২ শ্রমিক নিহত হয়। তাই ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ১ মে'কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালিত হচ্ছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে। বাংলাদেশেও এ দিনে সরকারি ছুটি থাকে। কিন্তু তারপরও কি শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছে বা পাচ্ছে? আসলে এসব দিবসটিবস দিয়ে কিছুই হবে না; বরং উল্টো মে দিবস পালনের নামে একদিন শ্রমিকরা কাজ না করায় বিশ্বজুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া যে কোনো বিক্ষোভে ফেতনা-ফাসাদ ও জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা তো রয়েছেই। যাহোক, আজও শ্রমিকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত, এখনও তাদের বিরাট অংশ মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। সাথে শিশুশ্রমের ব্যাপারটা না হয় না-ই উঠালাম।

সত্যি বলতে পৃথিবীর কোনো ধর্ম, আইন, মন্ত্রতন্ত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আন্দোলন-ধর্মঘট শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। কেবল ইসলামই নিশ্চিত করতে পেরেছে তাদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা। এমনকি মালিকের দিকটাও ইসলাম মোটেও উপেক্ষা করেনি। বরং উভয়ের প্রাপ্য ন্যায্য হিসসা বুঝিয়ে দেওয়ার ও নেওয়ার ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমনীতি শুধু ইসলামই দিতে পেরেছে। মালিকের কাজ আদায়ে যেন কোনো প্রকার ত্রুটি না হয় সেজন্য ইসলাম সামর্থ্যবান ও আমানতদার শ্রমিক নিয়ুক্ত করার প্রতি উৎসাহিত করেছে *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৬)*। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক যেহেতু দুর্বল থাকে এবং অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়, তাই তার অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম বেশি কঠোর ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি শ্রমিকের অধিকার রক্ষার ফযীলত ও মাহাত্ম্যের কথা ইসলামেই পাওয়া যায়। পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়া তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে কী পুরস্কার দিয়েছিলেন *(বুখারী, হা/২২৭২)*, তা আমাদের সকলের জানা। এটা কি ইসলামে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার মাহাত্ম্য প্রমাণ করে না? শ্রমিকদের সাথে মানবিক ও কোমল আচরণ, তাদের প্রতি দয়া ও হৃদ্যতা প্রদর্শনের সাথে সাথে তাদের অধিকার কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। তাদের উপর সাধ্যের বাইরে কাজ চাপাতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। কর্মঘণ্টা নির্ধারণও উক্ত নীতির আওতায় পড়ে। অধিকার তো দূরের কথা, এমনকি ইসলাম শ্রমিক ও মালিককে ভ্রাতৃত্বের ডোরে বেঁধেছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার ভাইকে তার অধীন করেছেন, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে খায়, সে কাপড় পরায়, যা সে পরে। তাকে সামর্থ্যের অধিক কোনো কাজের দায়িত্ব দেবে না। যদি এমনটা করতেই হয়, তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে' *(বুখারী, হা/৩০)*।

শ্রমিকের আরো যেসব অধিকারের কথা ইসলাম বলেছে: **(১) মালের অধিকার:** একজন শ্রমিকের এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এটা দুইভাবে হতে পারে: **ক.** সময়মতো মজুরি পরিশোধ করে। এ প্রসঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তোমরা তার মজুরি দিয়ে দাও' *(ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪৩)*। **খ.** ন্যায্য মজুরি পরিশোধ করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। ...আর একজন সে ব্যক্তি, যে কাউকে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে তার থেকে কাজ বুঝে নেয়, অথচ তার মজুরি দেয় না' *(বুখারী/২২২৭)*। নির্ধারিত মজুরির সামান্যতম কম করলে জান্নাত হারাম ও জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার ঘোষণা ইসলামে এসেছে *(মুসলিম, হা/১৩৭)*। **(২) স্বাস্থ্যের অধিকার:** শ্রমিককে এমন কাজে বাধ্য করা যাবে না, যেখানে তার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি রয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম-কে কাজে নিয়োগের সময় শুআইব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না' *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৭)*। এমন কাজে বাধ্য করলে শ্রমিক চুক্তি বাতিল করতে পারে। **(৩) সম্মানের অধিকার:** ইসলাম শ্রমিককে তার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে পর্যন্ত কোনো দিন ধমক তো দেননি; এমনকি কেন করেছো? কেন করোনি?- এরকম কথাও বলেননি *(বুখারী, হা/৬০৩৮)*। কোনো মুসলিমের সম্মানে আঘাত হানাকে ইসলাম হারাম করেছে *(মুসলিম, হা/২৫৬৪)*। আদমসন্তান হিসেবে সকলের সম্মানের ব্যাপারটা তো রয়েছেই *(আল-ইসরা, ১৭/৭০)*। **(৪) ইবাদতের অধিকার:** শ্রমিককে আল্লাহর ফরযকৃত ইবাদত আদায়ের সুযোগ দেওয়া ইসলামের নীতি; অন্যথায় মালিক দিকভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে *(ইবরাহীম, ১৪/৩)*। **(৫) বিচারের অধিকার:** এক পক্ষ যুলম করবে আরেক পক্ষ মাযলূম হবে- এটা হতে পারে না। সেজন্য একজন শ্রমিক তার উপর অন্যায়ের বিচার দাবির অধিকার রাখে। কারণ ইসলামে যাবতীয় যুলম হারাম *(মুসলিম, হা/২৫৭৭)*।

এভাবে সবদিক থেকে ইসলাম শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে। অতএব, শ্রমনীতিসহ সবকিছুতে ফিরে আসতে হবে ইসলামেই। তাহলেই শান্তি, তাহলেই মুক্তি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন।

একজন মুমিনের জীবনে কী প্রয়োজন?

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

সালামা ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহছান আল-খাত্বমী হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার (পিতা) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার বাসায় নিরাপদে দিন যাপন করে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে আর একদিন অতিবাহিত করার সমপরিমাণ খাবার তার নিকটে থাকে, তার যেন সমগ্র পৃথিবী হস্তগত হয়েছে'।[১]

أَصْبَحَ – (সকাল করল) এই বাক্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুমিন কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না। কেননা তার সকল বিষয় আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। তাছাড়া আল্লাহর উপর ভালো ধারণা রাখা এবং তাঁর নিকট কল্যাণের প্রত্যাশা করা প্রত্যেক মুমিনের নৈতিক কর্তব্য।

آمِنًا فِي سِرْبِهِ (পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকা) বলতে নিজ বাসায় বা চলার পথে নিরাপদে থাকার কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে এমন নিরাপত্তা অর্জন করে যে, জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে না বা তার মাল-সম্পদ খোয়া যাওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না কিংবা তার সম্ভ্রম হরণের কোনো প্রকার ভয় থাকে না।

ঈমান ও ইসলামের নিয়ামতের পর মানুষের নিকট সবচেয়ে বড় নিয়ামত জীবনের নিরাপত্তা। আর এই নিরাপত্তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য একমাত্র ওই ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারে, যে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যে ব্যক্তি এমন দেশ বা অঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে কঠিন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলে। কামানের গুলির বিকট শব্দ বার বার প্রতিধ্বনিত হয়। আকাশ থেকে যুদ্ধ বিমানের মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণ হৃদয়কে প্রকম্পিত করে। নির্বিচারে গুলি করে মানুষকে হত্যা করা হয় আর ক্ষেত-খামার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ সামান্য নিরাপত্তার জন্য পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। বুকের উপর হাত রেখে মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে নির্ঘুম রাত্রি যাপন করে। এমন অবস্থায় প্রকৃত মুমিনকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের (শিরকের) সাথে মিশায়নি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত' *(আল-আনআম-৬/৮২)*।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, ঈমানকে একনিষ্ঠ করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্তে আল্লাহ তাআলা মুমিনকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমনভাবে প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জাতিকে আর অবশ্যই তিনি তাদের জীবনবিধানকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে তারা আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে কোনো কিছু শরীক না করে। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই প্রকৃতপক্ষে ফাসিক্ব' *(আন-নূর, ২৪/৫৫)*। আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেছেন, 'তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার অলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণও নেই। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে শুভসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণীর কখনো পরিবর্তন হয় না আর এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য' *(ইউনুস, ১০/৬২-৬৪)*।

مُعَافًى فِي جَسَدِهِ (শারীরিক সুস্থতা) শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল এবং অসুখ-বিসুখমুক্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছে। অর্থাৎ সব ধরনের সমস্যামুক্ত হয়ে সুস্থ শরীর নিয়ে দিনটি অতিবাহিত করতে পেরেছে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর নিয়মিত রোগমুক্তি চাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট শ্বেতরোগ, পাগলামি, কুষ্ঠরোগ ও বিভিন্ন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি চাই'।[২]

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার নিকট ইবাদত আদায়ে একনিষ্ঠতা, পার্থিব বিষয়ের

---

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

[১] সুনানে তিরমীযী, হা/২৩৪৬।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০০৪।

সুস্থতা, স্বাস্থ্যকর জীবন, পরিবারিক পবিত্রতা ও অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করতেন। একইভাবে তিনি তাঁর ছহাবীগণের উল্লিখিত বিষয়গুলো চাওয়ার জন্য আদেশ দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআগুলো পড়া হতে কখনোই বিরত থাকতেন না। তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীনী বিষয়, আমার দুনিয়াবী বিষয়, আমার পরিবারিক বিষয় ও অর্থ-সম্পদের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও নিরাপত্তা চাই'।[৩]

মুআয ইবনু রিফাআ তার পিতা থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলেন, আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের প্রথম বর্ষে মিম্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করো। কেননা ঈমানের পরে তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে জিনিসটি দেওয়া হয়েছে, তা হলো সুস্বাস্থ্য'।[৪] আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্বাস্থ্য ও অবসার সময়ের সৎব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'বেশিরভাগ মানুষই আল্লাহর এই নিয়ামতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং প্রতারিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '(আল্লাহর) দুইটি নিয়ামত আছে, যার (সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব) সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই অসচেতন থাকে। তার একটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য আর অপরটি হচ্ছে অবসর সময়'।[৫] স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার যত্ন নেওয়া, পরিচর্যা করা প্রত্যেকের উচিত।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীছে তাঁর উম্মতকে অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গনীমত হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আদেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা পাঁচটি বস্তুকে অপর পাঁচটি বস্তুর আগমনের পূর্বে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করো। তার একটি হচ্ছে অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতা'।[৬] সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে গনীমত মনে করো। অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই সুস্থতার সৎ ব্যবহার করে পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যখন সকাল করবে, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করবে না। আর যখন সন্ধ্যা করবে, তখন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করবে না'।[৭] অর্থাৎ তোমরা সুস্থতার সময়কে ইবাদতের কাজে লাগিয়ে অসুস্থতার সময়ের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে নাও এবং তোমাদের জীবিত অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে পরকালীন সময়ের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।

বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তারা এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত, যার চিকিৎসার কোনো উপায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এসব রোগের লক্ষণ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপত্র প্রদানে সমগ্র বিশ্বের স্বনামধন্য এবং প্রথিতযশা চিকিৎসকগণ সম্পূর্ণরূপে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নিজেদের অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। যাতে করে স্বাস্থ্যকর জীবন লাভে ধন্য মুসলিম ভাই-বোন সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা যা চেয়েছিলে তার সবকিছুই তোমাদের প্রদান করা হয়েছিল। যদি তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*।

عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ (তার নিকট একদিনের খাবার আছে) অর্থাৎ তার নিকট এই পরিমাণ খাবার আছে, যা দিয়ে সে একদিন সকাল-সন্ধ্যা খেতে পারে। কারণ খাদ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দান করেছেন এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন' *(কুরায়েশ, ১০৬/৩-৪)*। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্ষুধা থেকে মুক্তি চাইতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট খাদ্যের অভাব থেকে মুক্তি চাই। কেননা অভুক্ত থাকার বেদনা কতই না যন্ত্রণাদায়ক'।[৮] আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকট এইভাবে খাদ্য সঙ্কটের প্রকোপ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তিনি এমন পরিমাণ আহার চেয়েছেন, যা তাঁর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে যথেষ্ট হয়। তাছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা থেকে নিজে বিরত থেকেছেন এবং ছাহাবীদের নিরুৎসাহিত করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -

---

[৩] সুনানে আবূ দাঊদ, হা/২৩৪৯।
[৪] সুনানে তিরমিযী, হা/২৮২১।
[৫] ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১২।
[৬] মুসতাদরাক হাকেম, হা/৭৯১৬।
[৭] ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬।
[৮] সুনানে আবূ দাঊদ, হা/১৫৪৭।

এর পরিবারের জন্য এমন পরিমাণ রিযিক্বের ব্যবস্থা করো, যা দিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা হয়'।[৯]

পূর্বের আলোচিত এই তিনটি নিয়ামতের সমন্বয় যদি কোনো মুমিনের প্রাত্যহিক জীবনে হয়ে যায়, তবে তাকে মনে করতে হবে যে তার জীবনে আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার জীবনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এমন পূর্ণতায় পৌঁছে গেল যে, মনে হয় যেন পুরো পৃথিবীর মালিকানা তার হস্তগত হয়ে গেছে। বর্তমান পৃথিবীতে বসবাসরত অনেক মুসলিম রয়েছে, যাদের ভাগ্যে এরূপ শত শত নয়, হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি গুণ অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ ঘটেছে। ব্যাপক নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ শারীরিক সুস্থতা এবং অঢেল সম্পদের সমাবেশ তাদের জীবনে ঘটেছে তবুও তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা যে অবস্থানে আছে, সেটাকে তারা নিজেদের জন্য অপমানজনক এবং লজ্জাকর মনে করে যা তাদের ক্ষুদ্র মানসিকতা ও পরকাল বিমুখতার পরিচায়ক। এই শ্রেণির মানুষের অবস্থার বিবরণ দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত কিন্তু তারপরও তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে আর তাদের বেশিরভাগই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ' *(আন-নহল, ১৬/৮৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তবে তারা কি আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?' *(আন-নাহল, ১৬/৭১)*।

আর এই সব মানসিক রোগের ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রত্যেকের উচিত হবে, ওই সমস্ত মানুষের প্রতি লক্ষ্য করা। যারা এই সমস্ত নিয়ামত উপভোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে, অথবা আংশিক কিংবা যৎকিঞ্চিত ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। যেমন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা তাদের লক্ষ্য করো, যারা (দুনিয়াবী সুবিধার বিচারে) তোমাদের চেয়ে নিচে অবস্থান করে আর তাদের প্রতি লক্ষ্য করো না, যারা (এক্ষেত্রে) তোমাদের উপরে অবস্থান করে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে অস্বীকার করার অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার এটাই সর্বোত্তম পন্থা'।[১০]

ইবনু জারীর ত্ববারী বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য যত কল্যাণ রয়েছে, তার সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন হাদীছের মধ্যে এটি সর্বোত্তম'। মানুষ যখন দুনিয়ায় আল্লাহর কোনো নিয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তার মনে এরূপ আরও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা জাগ্রত হয় এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত যে নিয়ামত তার নিকট আছে, তাকে সে ক্ষুদ্র মনে করে। সে উক্ত নিয়ামতের সম্পূর্ণ অংশ বা তার কাছাকাছি প্রাপ্তির জন্য প্রচণ্ড প্রতাশা করে। সে মনে করে, তার নিকট যা আছে, তার সবকিছুই তো অধিকাংশ মানুষের নিকট রয়েছে। (তাহলে তার বিশেষত্ব থাকল কোথায়?) অপরদিকে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যখন সে তার নিচের একজনের প্রতি দৃষ্টি দিবে, তখন তার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হবে। ফলে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, বিনয় ও নম্রতার পন্থা অবলম্বন করবে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে মনোযোগ দিবে'।[১১]

'পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা রাজকীয় জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে থাকে'। এই মর্মার্থ সম্বলিত হাদীছটি দিয়ে এই পাঠের সমাপ্তি করা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমরা কি দরিদ্র মুহাজির ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নই? তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে, যার নিকট আশ্রয় নাও? তখন সে বলল, জি, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, বসবাসের জন্য তোমার কোনো বাড়ি আছে, যেখানে তুমি বসবাস করতে পার? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি তো অবশ্যই ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আমার যদি কোনো খাদেম থাকে? তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তো বাদশাদের অন্তর্ভুক্ত।[১২]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আলোচনা যদি ভালোভাবে অনুধাবন করা হয়, তবে যার সুস্থ দেহ, নিরাপদ জীবন যাপনের ব্যবস্থা, বসবাসের জন্য একটা বাড়ি, জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন স্ত্রী আর প্রাত্যহিক জীবনের খরচ আছে, তার জীবনে কোনো দুঃখ-কষ্ট বা অভাব-অভিযোগ থাকবে না। দুনিয়ার জীবনে আর কোনো প্রাপ্তির তাড়না তাকে আহত করবে না। জীবন-জীবিকার জন্য প্রাপ্ত সম্পদ তাকে পরিতৃপ্ত ও তুষ্ট রাখবে। যে কোনো অভাব-অভিযোগ আর দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে। আত্মিক প্রশান্তি এবং মানসিক স্বস্তি লাভ করবে। পারিবারিক কলহ, সামাজিক অবিচার বা অন্য যে কোনো সমস্যা হালকা মনে হবে। সুন্দর স্ত্রী, মনোরম বাড়ি, আধুনিক চাকচিক্য, দুনিয়াবী শান-শওকত ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ কমে আসবে। দুনিয়ার জীবনে শান্তি এবং পরকালীন চির সুখের স্থান জান্নাত লাভের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের এই হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দিন- আমীন! ছুম্মা আমিন!!

---

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬০।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬৩।
১১. আল্লামা নবাবী, শারহে মুসিলম, ৬/৯৭।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৭৯।

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(মার্চ’২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৯)

হজ্জ ও উমরার সুন্নাতসমূহ :[১]

হজ্জ ও উমরার সুন্নাত বলতে এমন সব কাজকে বুঝায়, যা পালন করলে নেকী হবে, কিন্তু ছুটে গেলে হজ্জ ও উমরা বাতিল হবে না এবং দমও ওয়াজিব হবে না। তবে কেউ যদি অনীহা ও তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দেয়, তাহলে গুনাহগার হবে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়’।[২]

হজ্জ ও উমরার সুন্নাতসমূহ:- (১) ইযতেবা অর্থাৎ পুরুষদের ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া এবং ডান কাঁধ খালি রাখা। এটা শুধু প্রথম ত্বাওয়াফের সময় করতে হবে। (২) রমল অর্থাৎ প্রথম ত্বাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর দৌঁড়ের মতো করে দ্রুতপদে হাঁটা। অবশ্য এটা শুধু হজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে প্রথম যখন মক্কায় প্রবেশ করে উমরা করবে সেই উমরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী ত্বাওয়াফগুলোতে এটা করার প্রয়োজন নেই।[৩] (৩) ত্বাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করা অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত চুম্বন করা, অথবা লাঠি দিয়ে ইশারা করে লাঠি চুম্বন করা অথবা পাথরের দিকে হাতের ইশারা করা এবং আল্লাহু আকবার বলা। উল্লেখ্য, হাত দ্বারা ইশারা করলে হাত চুম্বন করতে হবে না। (৪) রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা। আর স্পর্শ করতে না পারলে এখানে হাত দ্বারা ইশারা করার বিধান নেই। (৫) ত্বাওয়াফ শেষে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা। (৬) ত্বাওয়াফোত্তর ছালাত শেষে যমযমের পানি পান করা। (৭) ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হয়ে যিকির করা, তাকবীর দেওয়া ও দুই হাত তুলে দু‘আ করা। (৮) ছাফা-মারওয়ার মাঝে সবুজ চিহ্নিত অংশে শুধু পুরুষদের দৌঁড়ানো। (৯) পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা। (১০) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছোট, মধ্যম ও বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু‘আ করা ইত্যাদি।

মীক্বাত :

‘মীক্বাত’ এর শাব্দিক অর্থ নির্দিষ্ট সময় বা স্থান। পারিভাষিক অর্থে মীক্বাত দুই প্রকার:

(১) মীক্বাতে যামানী (হজ্জ-উমরার নির্দিষ্ট সময়) : উমরা পালনের কোনো নির্ধারিত সময় নেই; বছরের যে কোনো সময় উমরা পালন করা যায়। কিন্তু হজ্জ পালনের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হজ্জের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যুলক্বা‘দাহ এবং যুলহিজ্জা মাসের প্রথম ১০ দিন। মোটকথা শাওয়াল মাসের ১ তারিখ হতে যুলহিজ্জা মাসের ১০ তারিখের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নির্দিষ্ট সময়ে হজ্জ পালন করা যায়। এর আগে বা পরে হজ্জ পালন করা যাবে না।

(২) মীক্বাতে মাকানী : হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন; মদীনাবাসীর জন্যে যুলহুলায়ফা, শামবাসীর জন্য জুহফা, নাজদবাসীর জন্য ক্বারনুল মানাযিল আর ইয়ামানবাসীর জন্য ইয়ালামলাম। তিনি আরো বলেন, এই মীক্বাতগুলো এসব এলাকাবাসীর জন্য এবং যারা এসব এলাকা অতিক্রম করে হজ্জ ও উমরা করতে আসবে, তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান। আর যারা এসব মীক্বাতের ভেতরে রয়েছে, তারা নিজ স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসী ইহরাম বাঁধবে মক্কা থেকে।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীর জন্য ‘যাতু ইরক’ মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন।[৫]

---

[১] **বি.দ্র.** বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[২] ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০১।

[৩] আবূ দাঊদ, হা/২০০১; মিশকাত, হা/২৬৭৩।

[৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮১; নাসাঈ, হা/২৬৫৪।

[৫] আবূ দাঊদ, হা/১৭৩৯; সুনানে দারাকুৎনী, হা/২৫২৮; মিশকাত, হা/২৫৩১।

উক্ত হাদীছদ্বয়ে ইহরাম বাঁধার মীক্বাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানেই ইহরাম বাঁধতে হবে; অন্য কোনো স্থানে ইহরাম বাঁধা যাবে না।

ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহের বিবরণ : ইহরাম বাঁধার স্থান পাঁচটি। স্থানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) যুলহুলায়ফা : এটি মক্কা হতে ৪৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। মদীনাবাসী এবং যারা এই পথ দিয়ে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত। বর্তমান এ স্থানকে 'আবইয়ারে আলী' বলা হয়।

(২) জুহফা : এটি মক্কা হতে ১৮৩ কি. মি. দূরে অবস্থিত। শাম, মিসর ও পশ্চিম আরব দেশগুলো এবং যারা এই পথ দিয়ে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত। বর্তমান জুহফার পার্শ্ববর্তী এলাকার নাম 'রাবেগ'। এখন এই স্থান হতেই ইহরাম বাঁধা হয়।

(৩) ক্বারনুল মানাযিল : এটি মক্কা হতে ৭৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত। নাজদবাসী এবং যারা এই পথ দিয়ে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত। বর্তমানে এই স্থানকে 'আস-সাইলুল কাবীর' বলা হয়।

(৪) ইয়ালামলাম : এটি মক্কা হতে ৭২ কি. মি. দূরে অবস্থিত। ইয়ামানবাসী এবং যারা এই পথ দিয়ে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত। এখানে অবস্থানরতরা বা এ পথের যাত্রীরা বর্তমানে 'সা'দিয়া' নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে থাকেন।

(৫) যাতু ইরক : এটি মক্কা হতে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত। ইরাকবাসী এবং যারা ওই পথ দিয়ে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা আসতে চাইলে এইসব মীক্বাত অথবা তার বরাবর স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর যারা মীক্বাতের ভেতরে অবস্থান করে, তারা আপন স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে আর মক্কাবাসী নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধবে।

মক্কাবাসীর ইহরাম মক্কাতেই বাঁধা : মীক্বাতের সীমানার ভিতরে হওয়ায় মক্কাবাসী স্ব স্ব গৃহ থেকেই ইহরাম বাঁধবে।[৬] এর জন্য তাদের তান'ঈমে যেতে হবে না। ছহীহ বুখারীর আলোচ্য হাদীছটির আলোকে বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ছান'আনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মক্কাবাসীর জন্যে হজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান হলো মক্কা। তিনি আরো বলেন, উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য মক্কাবাসীকে তান'ঈমে যেতে হবে মর্মে বর্ণিত আছারগুলো যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। তান'ঈম থেকে ইহরাম বাঁধার প্রমাণে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা এর যে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর অন্তরের প্রশান্তির জন্য।[৭]

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ : হজ্জ ও উমরার কার্যক্রম শুরু করার নিয়তকেই ইহরাম বলা হয়। 'ইহরাম' অর্থ 'হারাম করা'। ইহরাম বাঁধার কারণে কতগুলো কাজ হালাল হওয়া সত্ত্বেও হারাম হয়ে যায়। আর এজন্য একে ইহরাম বলা হয়। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ মোট নয়টি। যথা-

(১) চুল কাটা বা তুলে ফেলা : মাথার চুল, বগলের ও নাভির নিচের লোম এবং দাড়ি ও গোঁফ এমনকি শরীরের যে কোনো স্থান হতে কোন পশম উঠানো বা কাটা নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের মাথার চুল ন্যাড়া করো না, যে পর্যন্ত না কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*। এ আয়াতটি প্রমাণ করে ইহরাম অবস্থায় মাথার চুল কাটা যাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنهما زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর স্ত্রী হাফছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! লোকদের কী হলো তারা উমরা শেষ করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি উমরা হতে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন, আমি মাথায় আঠালো বস্তু[৮] লাগিয়েছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারব না।[৯] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম বাঁধার পর চুল কাটা বা তুলে ফেলা যাবে না।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَمَس مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلاَ يَأْخُذْنَ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمْنَ ظُفْرًا.

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন যুলহিজ্জার (প্রথম) ১০ দিন আসবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, সে যেন তার চুল বা শরীরের কোনো লোম না তুলে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে যেন চুল না কাটে এবং নখ না কাটে।[১০] এ হাদীছে প্রমাণিত হয়, মাথার চুল ও নক কাটা যাবে না।

(চলবে)

---

[৬] ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৮১; নাসাঈ, হা/২৬৫৪।

[৭] সবুলুস সালাম, ২/৪৭৭।

[৮] প্রাচীনকালে সফরের সময় বাতাসে চুল যেন এলোমেলো না হয়ে যায় সেজন্য জেলের মতো আঠালো পদার্থ ব্যবহার করা হতো।

[৯] ছহীহ বুখারী, হা/১৫৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১২২৯; মওয়াত্ত্বা মালেক, পৃ. ৫৭৮।

[১০] ছহীহ মুসলিম, হা/৫২৩২; মিশকাত, হা/১৪৫৯।

ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা

মূল : আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন লুতফুল হক ভারতী**

[এই গ্রন্থটি মূলত ১৩৯২ হিজরীর পবিত্র রামাযান মাসে কাতারের রাজধানী দোহা শহরে দেওয়া আলবানী রাহিমাহুল্লাহ *-এর একটি লেকচার। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এবং এই ধরনের বিষয়ে মুসলিমদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে কিছু দ্বীনী ভাই এটি বই আকারে ছাপতে তাঁকে পরামর্শ দেন। তাদের পরামর্শ অনুসারে এটি বই আকারে ছাপার সিদ্ধান্ত নেন তিনি, যাতে সবাই উপকৃত হতে ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। পাঠকগণের সুবিধার কথা ভেবে তিনি এর সাথে কিছু শিরোনামও যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাকে তাঁর দ্বীন ও শরীআতের হেফাযতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এর উত্তম প্রতিদান দান করেন। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অতি দয়ালু ও দু'আ কবুলকারী।]*

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে সারা দুনিয়ায় বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক্ব আদায় করে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' *(আন-নিসা, ৪/১)*। 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০)*।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

অতঃপর আলেম ও জ্ঞানীদের এই মহাসম্মেলনে নতুন কিছু পেশ করতে পারব বলে আমার মনে হয় না। আমার এই ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমার এই আলোচনাটি নছীহতস্বরূপ হবে এবং আমি আল্লাহর এই আদেশের অনুসরণকারী হব- 'আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কারণ নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৫)*।

রামাযানুল মুবারকের এই পবিত্র রাতে, আমি রামাযানের ফযীলত, আহকাম ও তারাবীর গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না, বরং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আর সেটি হচ্ছে **'ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা'**।

কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক : আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে শেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন, তাঁকে রিসালত দান করেছেন ও তাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। তাঁকে যা কিছু আদেশ করেছেন, তন্মধ্যে একটি আদেশ ছিল কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং মানুষকে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আপনার প্রতি আমি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন' *(আন-নাহল, ১৬/৪৪)*।

আমি মনে করি, উপরিউক্ত আয়াতে মানুষকে কুরআনের যে বর্ণনা ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাঁর বর্ণনা এই দু'টি পদ্ধতিতে হয়েছে- একটি মানুষের কাছে কুরআনের শব্দ ও বাক্য হুবহু পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে এ কথাই বলেছেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা পৌঁছে দিন' *(আল-মায়েদা, ৫/৬৭)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোনো কথা গোপন রেখেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ

---

* পিএইচডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

দেয়’।[১] মুসলিমের আর এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বলেন, যদি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর অবতীর্ণ অহীর কোনো অংশ গোপন করতেন, তবে তিনি এ আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন, ‘স্মরণ করুন! আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর আপনি আপনার অন্তরে এমন কিছু গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশকারী। আপনি লোককে ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সংগত’।[২]

আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। অর্থাৎ কুরআনের শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা উম্মতকে জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ আয়াতকে সীমাবদ্ধ করেছেন। আবার শর্তযুক্ত আয়াতকে সাধারণ করেছেন। আর তা হয়েছে তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে।

কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা ও তার কিছু উদাহরণ : আল্লাহ তাআলা বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ‘পুরুষ চোর ও নারী চোরের হাত কেটে দাও’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩৮)*। কুরআনের এই আয়াতে কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে এটা বলা হয়নি। কী পরিমাণ হাত কাটতে হবে, কব্জি থেকে না কনুই থেকে? এটাও বলা হয়নি। শুধু সুন্নাহতেই এর বিবরণ এসেছে যে, কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। হাদীছে এসেছে, কেবল ঐ চোরের হাত কাটা যাবে, যে এক দ্বীনারের চার ভাগের এক ভাগ বা এর বেশি চুরি করবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এক-চতুর্থাংশ দীনার অথবা এর অধিক মাল চুরি ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না’।[৩]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণের আমল ও অনুমোদন দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁরা চোরের কব্জি পর্যন্ত হাত কাটতেন, যেমনটি হাদীছ গ্রন্থে সুপরিচিত বিষয়।

তায়াম্মুমের আয়াতে যে হাত মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ‘তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত মাসাহ করো’ *(আন-নিসা, ৪/৪৩)*। সুন্নাহতে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এখানে ‘হাত মাসাহ করা’ থেকে কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করা বোঝানো হয়েছে, কনুই পর্যন্ত নয়। আমি এখানে কুরআনের আয়াতের আরো কিছু উদাহরণ পেশ করব, যে আয়াতগুলো সুন্নাহ ব্যতীত সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়।

(১) আল্লাহ তাআলা বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্যই এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত’ *(আল-আন‘আম, ৬/৮২)*। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি’-এর মধ্যে ‘যুলম’ শব্দটি থেকে কিছু ছাহাবীর ভুল ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় এখানে যুলম থেকে সব ধরনের যুলম ও অন্যায়কে বোঝানো হয়েছে, যদিও তা নগণ্য হোক না কেন। ছাহাবীগণের কাছে এ আয়াতটি খুব কঠিন মনে হলো। তাই তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর যুলম করেনি? তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এখানে অর্থ তা নয়; এখানে যুলমের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শোনোনি, লুক্বমান তাঁর ছেলেকে নছীহত করার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় শিরক একটা বিরাট যুলম’।[৪]

(২) আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ‘তোমরা যখন সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে ছালাত ক্বছর করাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই’ *(আন-নিসা, ৪/১০১)*। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটাই যে, ক্বছর কেবল ভয়-ভীতির অবস্থার জন্য; শান্তির অবস্থায় ক্বছর করা যাবে না। তাই কিছু ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখন তো আমরা নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত হয়ে গেছি। অতএব এখন ছালাত ক্বছর করার কী প্রয়োজন? এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এটা তো তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ছাদাক্বা। অতএব তোমরা তার ছাদাক্বা গ্রহণ করো’।[৫]

(৩) আল্লাহ তাআলা বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ‘তোমাদের জন্য মৃত জন্তু ও রক্ত হারাম করা হয়েছে’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। কিন্তু সুন্নাহতে বলা হয়েছে যে, দুই প্রকারের মৃত প্রাণী এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘খাদ্যরূপে দুই প্রকারের মৃত প্রাণী এবং দুই প্রকার রক্তকে আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। দুই প্রকার মৃত প্রাণী হচ্ছে, পঙ্গপাল ও মাছ এবং দুই প্রকার রক্ত হচ্ছে কলিজা ও

---

[১] ছহীহ বুখারী, হা/৪৬১২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৭।

[২] ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৮।

[৩] ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৪।

[৪] ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪।

[৫] ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬।

সূচিপত্র

হৃৎপিণ্ড’।[৬] বায়হাক্বী ও অন্যান্য ইমাম এটিকে মারফূ‘ ও মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন এবং মাওকূফ বর্ণনার সনদ ছহীহ। আর মাওকূফ বর্ণনাটি মারফূ‘র হুকুম রাখে। কারণ এটা এমন একটি বিষয়, যা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বলা যায় না।

(৪) আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ‘আপনি বলুন, আমার নিকট যে অহী এসেছে, তাতে এমন কোনো বস্তু পাই না, যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম, মৃত প্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ছাড়া। কারণ তা নাপাক। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ’ *(আল-আন‘আম, ৬/১৪৫)*। কিন্তু এ আয়াতে উল্লেখিত চারটি জিনিস ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিসের হারাম হওয়ার উল্লেখ একাধিক হাদীছে এসেছে। যেমন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম সব ধরনের হিংস্র জন্তু এবং সব ধরনের নখধারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন’।[৭] যেমন অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে যে, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক’।[৮]

(৫) আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ‘বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সাজসজ্জা এবং পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?’ *(আল-আ‘রাফ, ৭, ৩২)*। অথচ হাদীছে এসেছে যে, কিছু শোভা-সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার বস্তু আছে, যেটা হারাম। নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, ‘একদা তিনি বের হলেন, তাঁর এক হাতে রেশম আর অন্য হাতে স্বর্ণ ছিল। তিনি বললেন, এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম’।[৯] এই হাদীছটি ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছটি ছহীহ বলেছেন। এই বিষয়ে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

উল্লেখিত উদাহরণ ছাড়াও আরও অগণিত অনেক উদাহরণ আছে, যা হাদীছ ও ফিক্বহ বিশারদগণের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকটে ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব সাব্যস্ত হয়। এই উদাহরণগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, সুন্নাহ বা হাদীছ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়া সঠিকভাবে কুরআনের অর্থ বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

১ম উদাহরণে ‘যুলম’ শব্দটি থেকে ছাহাবায়ে কেরাম যুলমের সাধারণ অর্থ পাপ এবং অত্যাচার মনে করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু তাঁদের সম্পর্কে বলেন, ‘তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে আত্মার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি নেককার, সর্বাধিক গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও সর্বাধিক কৃত্রিমতা পরিহারকারী’। লক্ষ্য করুন, তাঁদের এত গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত ‘যুলম’ শব্দের অর্থ ভুল বুঝেছিলেন। যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ভুল শুধরিয়ে না দিতেন এবং বুঝিয়ে না দিতেন যে, এখানে যুলম মানে শিরক, তাহলে আমরাও তাঁদের ভুলের অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা ও সুন্নাহ দ্বারা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করেছেন।

২য় উদাহরণটি দেখুন, আমরা যদি হাদীছের দিকে ফিরে না যেতাম, তাহলে শান্তির অবস্থায় ছালাত ক্বছর করা যাবে কি-না কমপক্ষে এই ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ থেকেই যেত- যদিও তা শর্ত মনে না করতাম। যেমন কোনো কোনো ছাহাবীর মনে এ ধারণা এসেছিল যে, এখন তো আমরা নিরাপদ, তাই এখন ছালাত ক্বছর করার কী প্রয়োজন? কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে শান্তির অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতে দেখেছেন এবং তাঁরাও তাঁর সাথে ক্বছর করেছেন। তাই তাঁদের এ ধারণার নিরসন হয়।

৩য় উদাহরণে আমরা যদি হাদীছের অনুসরণ না করতাম, তাহলে মৃত টিড্ডী ও মাছ এবং কলিজা ও প্লীহা আমাদের জন্য হারাম হয়ে যেত।

৪র্থ উদাহরণটি লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা যদি হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন না করতাম, তাহলে হিংস্র জন্তু ও নখধারী পাখি, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখে হারাম করেছেন, আমরা তা হালাল মনে করতাম।

অনুরূপভাবে ৫ম উদাহরণেও আমরা যদি হাদীছের অনুসরণ না করতাম, তাহলে রেশম ও স্বর্ণ যে দুটো আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখে হারাম করেছেন, আমরা তা হালাল ভাবতাম। আর এই কারণেই কিছু সালাফ বলে থাকেন যে, সুন্নাহ কুরআনের অর্থ স্পষ্ট করে দেয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

---

৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৭২৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩২১৮’ বায়হাক্বী, হা/১১৯৬।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৪।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৪০।

৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৫০; আবূ দাঊদ, হা/৪০৫৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৯৫।

তারাবীহর রাকআত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

*-আহমাদুল্লাহ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দলীল-৯ : মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী বলেছেন, লোকেরা উমার ইবনু খাত্ত্বাবের যামানায় রামাযানে ২০ রাকআত পড়তেন। তারা তাতে দীর্ঘ ক্বিরাআত করতেন এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন।

জবাব : এই রেওয়ায়াতটির সনদ নেই। সুতরাং এটি ভিত্তিহীন।

দলীল-১০ : ইয়াযীদ ইবনু খুছায়ফা বলেছেন, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ বলেছেন, তারা উমার ইবনুল খাত্ত্বাবের যুগে রামাযান মাসে ২০ রাকআত পড়তেন। তিনি বলেছেন, তারা ছালাতে শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরা পড়তেন। আর তারা তাদের লাঠির উপর ভর দিতেন উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর যুগে ক্বিয়ামের (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার) কষ্টের কারণে।[১]

জবাব : এই রেওয়ায়াতটি আলী ইবনুল জাদ-এর 'মুসনাদ' গ্রন্থেও বিদ্যমান।[২] তা সত্ত্বেও খোদ আলী ইবনুল জাদ-এর উপর সমালোচনা আছে। উপরোল্লিখিত আলী ইবনুল জাদ উছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে আযাব দিলে আমার কাছে মোটেও খারাপ লাগবে না'।[৩]

সতর্কীকরণ : এই রেওয়ায়াতের মধ্যে ক্বিয়ামকারীদের পরিচয় অজ্ঞাত রয়েছে।

এই অজ্ঞাত লোকেরা যদি নিজেদের ঘরে নফল অনুধাবন করে ২০ রাকআত পড়ে থাকেন, তাহলে উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে এর কী সম্পর্ক, যারা এ হাদীছ দিয়ে দলীল দেন তারা নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রমাণ করবেন :

(ক) ঐ লোকেদের নাম বলতে হবে, যারা ফারূক্বী যামানায় ২০ রাকআত পড়তেন। (খ) এটি প্রমাণ করতে হবে যে, তারা ২০ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অনুধাবন করে পড়তেন। (গ) প্রমাণ করতে হবে যে, তারা মসজিদে নববীতে জামাআতের সহিত এই রাকআতসমূহ পড়তেন। (ঘ) এটি প্রমাণ করুক যে, উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর এ বিষয়টি জানা ছিল। (ঙ) প্রমাণ করতে হবে, এই লোকেরা ২০ এর কম অথবা বেশি করা হারাম বা নাজায়েয অনুধাবন করতেন। (চ) প্রমাণ করতে হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা এই আছার দ্বারা দলীল গ্রহণ করে এটি প্রমাণিত করেছেন যে, স্রেফ ২০ রাকআত তারাবীহই হলো জামাআতের সাথে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তার থেকে কম বা অধিক করা জায়েয নেই।

দলীল-১১ : সায়িব ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিতে আছে, আমরা উমারের যুগে ২০ রাকআত এবং বিতর পড়তাম।[৪]

জবাব : এই বর্ণনাটি শায। খালেদ ইবনু মাখলাদের (শীআ) এই বর্ণনাটির বিপরীতে ইমাম সাঈদ ইবনু মানছূর-এর বর্ণনা আছে যে, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ বলেছেন, আমরা উমার এর যুগে ১১ রাকআত পড়তাম।[৫]

দলীল-১২ : আবূ আব্দির রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রামাযানুল মুবারকে ক্বারীদেরকে আহ্বান করে তাদের মধ্য হতে একজনকে ২০ রাকআত পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। আবূ আব্দির রহমান বলেন, আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাদেরকে বিতরের ছালাত পড়াতেন।[৬]

জবাব : এই বর্ণনার রাবী হাম্মাদ ইবনু শুআইবকে জমহূর মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার মাঝে আপত্তিকর বস্তু রয়েছে।[৭] অর্থাৎ তিনি মাতরূক রাবী।

দলীল-১৩ : আ'মাশ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতর আদায় করতেন।[৮]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

[১] বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৪২৮৮।

[২] আলী ইবনুল জাদ, মুসনাদ, হা/২৮২৫।

[৩] তাহযীবুত তাহযীব, ৭/২৫৭।

[৪] মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৫৪০৯; নবীজীর নামায পৃ. ৪০৮।

[৫] আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৩৪৯; হাশিয়া আছারুস সুনান, পৃ. ২৫০।

[৬] বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৪২৯১।

[৭] আত-তারীখুল কাবীর, ৩/২৫।

[৮] মারওয়াযী, মুখতাছার ক্বিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১৫৬।

জবাব : এই বর্ণনা কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যাত। (ক) মারওয়াযীর মুখতাছার ক্বিয়ামুল লায়লের (পৃ. ২০০) এই বর্ণনা সনদবিহীন। (খ) এর রাবী 'হাফছ ইবনু গিয়াছ মুদাল্লিস রাবী।[৯] (গ) আ'মাশও মুদাল্লিস রাবী।[১০] (ঘ) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মৃত্যুর এক যুগ পর ৬১ হিজরীতে আ'মাশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই সনদটি মুনক্বাত্বি'।

দলীল-১৪ : أَنْبَأَ أَبُوْ الْخُصَيبِ قَالَ : كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً আবুল খুছায়ব বলেছেন, সুওয়াইদ ইবনু গাফালা রামাযানে আমাদেরকে তারাবীহ পড়াতেন। তিনি ২০ রাকআত পড়াতেন পাঁচ তারবীহা সহকারে।[১১]

জবাব : সুওয়াইদ ইবনু গাফালার (তাবেঈ) এই বর্ণনাটিতে এটি স্পষ্টভাবে বলা নেই যে, তিনি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করে ২০ রাকআত পড়তেন। সুতরাং এই আছারটি দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের দাবির পক্ষে দলীল নয়।

দলীল-১৫ : عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ আবুল বাখতারী হতে বর্ণিত, তিনি রামাযানে পাঁচ তারবীহা (এখানে ২০ রাকআত তারাবীহ উদ্দেশ্য) এবং ৩ রাকআত বিতর পড়তেন।[১২]

জবাব : এই বর্ণনাটির উপর দুটি আলোচনা রয়েছে। (ক) রবী ও খালাফের নির্দিষ্টতা প্রতীয়মান নয়। সুতরাং এই সনদটি যঈফ। (খ) এই বর্ণনায় এর স্পষ্ট বিবরণ নেই যে, আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফায়রূয আত-তাঈ এই ২০ রাকআত তারাবীহকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করে আদায় করার প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন। সুতরাং দলীল ও দাবির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

দলীল-১৬ : عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস বর্ণনা করেছেন, শুতায়র ইবনু শাকাল রামাযানে ২০ রাকআত এবং বিতর পড়তেন।[১৩]

জবাব : এই বর্ণনাটি দুটি কারণে যঈফ। (ক) সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটি মুআনআন। (খ) আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটি মুআনআন।

দলীল-১৭ : عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ হারেছ রামাযানে রাতের বেলায় লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত পড়াতেন এবং তিনি রুকূর আগে কুনূত পাঠ করতেন।[১৪]

জবাব : এই আছারটি কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যাত। যথা- (ক) আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ মুদাল্লিস। আর এই বর্ণনাটি মুআনআন। (খ) হাজ্জাজ ইবনু আরত্বা যঈফ মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটি মুআনআন। (গ) আবূ মুআবিয়া আয-যরীর মুদাল্লিস রাবী। আর এই বর্ণনাটি মুআনআন। (ঘ) হারেছ আওয়ার কাযযাব ও সমালোচিত রাবী। ইমাম শা'বী (তাবেঈ) বলেছেন, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি অন্যতম একজন কাযযাব রাবী।[১৫] আবূ খায়ছামা বলেছেন, হারেছ আওয়ার কাযযাব রাবী।[১৬]

দলীল-১৮ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ ইবরাহীম নাখাঈ লোকদেরকে নিয়ে রামাযানে পাঁচ তারবীহা পড়তেন।[১৭]

জবাব : এই বর্ণনাটি কতিপয় কারণে প্রত্যাখ্যাত- (ক) ইউসুফ ইবনু আবূ ইউসুফ আল-ক্বযীর তাওছীক প্রতীয়মান নয়। (খ) হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান মুখতালিত রাবী। হাফেয হায়ছামী লিখেছেন, 'হাম্মাদের স্রেফ ঐ বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হয়, যা তার পুরাতন ছাত্ররা— শুবা, সুফিয়ান ছাওরী এবং হিশাম দাসতাওয়াঈ বর্ণনা করেছেন। এই তিনজন ব্যতীত অন্যরা তার ইখতিলাতের পর তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন'।[১৮] (গ) হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান মুদাল্লিস রাবী।[১৯] আর এই বর্ণনাটি মুআনআন। (ঘ) কিতাবুল আছার গ্রন্থটি আবূ ইউসুফ হতে প্রমাণিত নেই। (ঙ) এতে ২০ রাকআতের সুন্নাতে

---

[৯] তবাকাতে ইবনু সা'দ, ৬/৩৯০।
[১০] আত-তালখীছুল হাবীর, হা/১১৮১।
[১১] বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৪২৯০।
[১২] মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮৬।
[১৩] মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮০।
[১৪] মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮৫।
[১৫] আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, ৩/৭৮, সনদ ছহীহ।
[১৬] আল-জারহু ওয়াত তা'দীল, ৩/৭৯, সনদ ছহীহ।
[১৭] আবূ ইউসুফ, কিতাবুল আছার, হা/২১১।
[১৮] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১১/১১৯, ১২০।
[১৯] তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, ২/৪৫।

মুয়াক্কাদা হওয়ার স্পষ্ট বিবরণ নেই। সুতরাং ২০ রাকাতের দাবিদারদের দাবি ও দলীলের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

দলীল-১৯ : عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ আতা ইবনু আবী রবাহ বলেছেন, আমি লোকদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং বিতর পড়তে দেখেছি।[20]

জবাব : এই আছার সম্পর্কে কতিপয় বিষয় লক্ষণীয়। (ক) এখানে দাবি ও দলীলেন মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। কেননা এই আছারে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। (খ) ‘লোকদেরকে’-এর কোনো স্পষ্ট আলোচনা নেই যে তারা কারা? আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেছেন, তিনটি বস্তুকে লোকেরা ত্যাগ করেছে। যার মধ্যে তৃতীয় বস্তু এই যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উঠাতেন।[21] এখানে ‘লোকেরা’-দ্বারা কি ছাহাবীগণ এবং তাবেঈদেরকে উদ্দেশ্য করা যাবে এবং তাকবীর ব্যতীত সিজদা করা যাবে? আর একে কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করা যাবে?

দলীল-২০ : নাফে‘ বলেছেন, ‘ইবনু আবী মুলায়কা আমাদের সাথে নিয়ে রামাযানে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন’।[22]

জবাব : দেওবন্দীদের দাবি ‘২০ রাকআত হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা’-এর সাথে এর কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। কেননা এতে এটা লিখিত নেই যে, ইবনু আবী মুলায়কা ২০ রাকআতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করে পড়তেন।

৮ রাকআত তারাবীহ ও হানাফী আলেম : এখন এই প্রবন্ধে হানাফী তাকলীদীর বরাত পেশ করা হচ্ছে, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই লোকদের নিকটেও ৮ রাকআত তারাবীহ হলো সুন্নাত। যথা- (১) ইবনু হুমাম হানাফী (মৃ. ৮৬১ হি.) লিখেছেন, আলোচনার সারকথা এই যে, ক্বিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) ১১ রাকআত বিতরসহ, জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাত।[23] (২) সাইয়েদ ত্বাহত্বাবী হানাফী (মৃ. ১২৩৩ হি.) বলেছেন, কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ২০ রাকআত পড়েননি। বরং তিনি ৮ রাকআত ছালাত আদায় করেছেন।[24] (৩) ইবনু নুজাইম মিছরী (মৃ. ৯৫০ হি.) ইবনু হুমাম হানাফী হতে সত্যায়নসহ বর্ণনা করেছেন যে, অতএব এভাবে আমাদের শায়খদের উছূল মোতাবেক ৮ রাকআত তারাবীহ মাসনূন এবং ১২ রাকআত তারাবীহ মুসতাহাব হয়ে যায়।[25] (৪) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেছেন, এইসবের সারকথা এই যে, ক্বিয়ামে রামাযান ১১ রাকআত বিতরসহ জামাআতে আদায় করা সুন্নাত। নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমল এটাই ছিল।[26] (৫) দেওবন্দীদের মানযূর মুহাম্মাদ আহসান নানূতুবী (মৃ. ১৩১২ হি.) বলেছেন, কেননা নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ২০ রাকআত পড়েননি; বরং তিনি ৮ রাকআত পড়েছেন।[27] (৬) দেওবন্দীদের নয়নমণি আব্দুশ শাকূর লাখনভী (মৃ. ১৩৮১ হি.) লিখেছেন, যদিও নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে ৮ রাকআত তারাবীহ মাসনূন বর্ণিত আছে; আর একটি যঈফ হাদীছে ইবনু আব্বাস হতে ২০ রাকআতও আছে। কিন্তু...।[28] (৭) দেওবন্দীদের নয়নমণি আব্দুল হাই লাখনভী (মৃ. ১৩০৪ হি.) লিখেছেন, তিনি তারাবীহকে দুইভাবে আদায় করেছেন। (ক) ২০ রাকআত তারাবীহ জামাআতের সাথে। ...কিন্তু এই বর্ণনার সনদটি যঈফ...। (খ) ৮ রাকআত এবং ৩ রাকআত বিতর জামাআতের সাথে...।[29] (৮) খলীল আহমাদ সাহারানপূরী দেওবন্দী (মৃ. ১৩৪৫ হি.) লিখেছেন, অবশ্য কতিপয় আলেম যেমন ইবনু হুমাম ৮ রাকআতকে সুন্নাত এবং অতিরিক্ত রাকআতকে মুসতাহাব লিখেছেন। তাদের এই বক্তব্য সমালোনাযোগ্য নয়।[30] খলীল আহমাদ সাহারানপূরী আরো লিখেছেন, আর ৮ রাকআত তারাবীহর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়া ঐকমত্যপ্রাপ্ত। যদি মতানৈক্য থাকে, তাহলে ১২ রাকআতের ক্ষেত্রে রয়েছে।[31] (৯) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেছেন, আর একে স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর তারাবীহ ছিল ৮ রাকআত। আর কোনো একটি বর্ণনাতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম

---

[20] ২০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮৮।
[21] ২১. সুনানে নাসাঈ, হা/৮৮৪, ২/১২৪, সনদ ছহীহ।
[22] ২২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৭৬৮৩।
[23] ২৩. ফাতহুল ক্বাদীর শরহে হেদায়া, ১/৪০৭, ‘নফল ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[24] ২৪. হাশিয়া ত্বাহত্বাবী আলাদ দুররিল মুখতার, ১/২৯৫।
[25] ২৫. আল-বাহরুর রায়েক্ব, ২/৬৭।
[26] ২৬. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, হা/১৩০৩, ৩/৩৮২।
[27] ২৭. হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়েক্ব, পৃ. ৩৬-এর টীকা : ৪ দ্রষ্টব্য।
[28] ২৮. ইলমুল ফিক্বহ, পৃ. ১৯৮-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
[29] ২৯. মাজমূ‘ ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ১/৩৩১, ৩৩২।
[30] ৩০. বারাহীনে ক্বাতেআহ, পৃ. ৮।
[31] ৩১. বারাহীনে ক্বাতেআহ, পৃ. ১৯৫।

রামাযানে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ আলাদাভাবে আদায় করেছেন...। রইল ২০ রাকআতের বিষয়টি, তো তার থেকে ৮ রাকআত তারাবীহই প্রমাণিত আছে। আর ২০ রাকআতের হাদীছটি নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যঈফ সনদে বর্ণিত। আর এর যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য আছে।[৩২] (১০) তারাবীহ ছালাত সম্পর্কে হাসান ইবনু উমারাহ ইবনু আলী আশ-শুরুনবুলালী হানাফী (মৃ. ১০৬৯ হি.) বলেছেন, (আর একে জামাআত সহকারে আদায় করা সুন্নাতে কেফায়াহ) কেননা এটা প্রমাণিত আছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে ১১ রাকআত বিতরসহ আদায় করেছেন।[৩৩]

তারাবীহ ২০ রাকআত হওয়ার উপর ছাহাবায়ে কেরামের ইজমার দাবি কতটুকু সত্য : (১) ইবনু কুদামা বলেন, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে বর্ণনা করেছেন, উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাকআত পড়তেন। আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি একজন ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন, সে যেন লোকদের নিয়ে রামাযানে ২০ রাকআত পড়ায়। আর এটা ইজমার অনুরূপ।

জবাব : ইবনু কুদামার দাবির ভিত্তি দুটি বর্ণনার উপর- (ক) ইয়াযীদ ইবনু রূমানের বর্ণনা, যাকে আইনী হানাফী মুনক্বাত্বি' বলেছেন। (খ) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর পক্ষ হতে যা সনদের দৃষ্টিকোণ হতে যঈফ। এই দুটি যঈফ বর্ণনার কারণে ইবনু কুদামা ইজমার অনুরূপ লিখে দিয়েছেন।

(২) কাসতালানী শাফেঈ বলেছেন, উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর যুগে যা হত (২০ রাকআত তারাবীহ), তাকে ফক্বীহগণ ইজমার ন্যায় মনে করেছেন।

জবাব : ইজমার এই দাবি কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাখ্যাত- (ক) এই দাবির ভিত্তি যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাসমূহের উপর। যেমনটা ইবনু কুদামার উক্তির ব্যাখ্যায় গত হয়েছে। (২) উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে ১১ রাকআত ছহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত আছে।[৩৪]

২০ রাকআত তারাবীহর উপর ইজমার দাবি বাতিল : এখন আপনার খেদমতে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। যেগুলোর প্রত্যেকটির আলোকে উক্ত ইজমার দাবি বাতিল হয়।

(১) ইমাম মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন, আমি আমার জন্য ১১ রাকআতকে পছন্দ করেছি। এর উপরই উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-লোকদেরকে একত্র করেছিলেন এবং এটাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত ছিল।[৩৫] ইমাম চতুষ্টয় হতে একজন থেকেও এটা প্রমাণিত নেই যে, ২০ রাকআত তারাবীহ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং এর উপর ইজমা হয়েছে। (২) ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৫৬ হি.) বলেছেন, তারাবীহর সংখ্যায় আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে। অধিকাংশ আলেম এটা বলেন যে, ১১ রাকআত হাদীছে রয়েছে। তারা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর পূর্বের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহন করেছেন।[৩৬] (৩) আইনী হানাফী (মৃ. ৭৫৫ হি.) বলেছেন, তারাবীহর মুসতাহাব সংখ্যা নিয়ে আলেমগণ ইখতিলাফ করেছেন। তারা অনেক কথাই বলেছেন। আর বলা হয় যে, তারাবীহ হলো ১১ রাকআত।[৩৭] (৪) আল্লামা সুয়ূত্বী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেছেন, তারাবীহ সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন।[৩৮] (৫) ইবনু হুমাম (মৃ. ৬৮১ হি.) বলেছেন, এই সকল আলোচনা হতে এই সারকথা বের হয়ে আসল যে, বিতরের সাথে তারাবীহ ১১ রাকআত রয়েছে। একে নবী কারীম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা জামাআতের সাথে পড়েছেন।[৩৯] (৬) ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আলেমগণ ক্বিয়ামে রামাযান সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন।[৪০]

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, তারাবীহ হলো ৮ রাকআত। একে ২০ রাকাতের মধ্যে খাছ করা সুন্নাত বহির্ভূত কাজ। এ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হুবহু অনুসরণই আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। এ ব্যতীত বাঁচার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ আমদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

[৩২] আল-আরফুশ শাযী, ১/১৬৬।

[৩৩] মারাক্বিল ফালাহ শরহে নূরুল ঈযাহ, পৃ. ৯৮।

[৩৪] আছারুস সুনান, হা/৭৭৬, সনদ ছহীহ।

[৩৫] ইবনু মুগীস মালেকী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, পৃ. ৮৯০।

[৩৬] আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম, ২/৩৮৯, ৩৯০।

[৩৭] উমদাতুল ক্বারী, ১১/১২৬, ১২৭।

[৩৮] আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৩৪৮।

[৩৯] ফাতহুল ক্বাদীর শরহে হেদায়া, ১/৪০৭।

[৪০] তিরমিযী, হা/৮০৬।

তাক্বদীর নিয়ে কিছু কথা

*-সাঈদুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটি হাদীছে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِه

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব সময় মানুষ (বিভিন্ন ব্যাপারে) পরস্পর কথোপকথন করতে থাকে। পরিশেষে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, এসব তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? তাই যে ব্যক্তির মনে এ জাতীয় সংশয়-সন্দেহের উদয় হয়, সে যেন বলে উঠে, আমি আল্লাহর প্রতি ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।[১]

তাক্বদীর নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়; বরং আমাদের উচিত হলো আমলে অগ্রসর হওয়া। অনেকে একটি প্রশ্ন করে যে, তাক্বদীর যেহেতু নির্ধারিত, সেহেতু আমল করার কী প্রয়োজন? ছাহাবীরাও নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে একি ধরনের প্রশ্ন করেছিল, তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُه مِنْ الْجَنَّةِ» وَمَقْعَدُه مِنْ النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ : اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَه أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى)

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অবস্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে লিখে রাখেননি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের তাক্বদীরের লেখার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিব না? নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, (না, বরং) আমল করে যেতে থাকো। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, তাকে আল্লাহ সৌভাগ্যের কাজ করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন। আর সে ব্যক্তি দুর্ভাগা হবে, যার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে'। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম (কুরআনের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (সময় ও অর্থ) ব্যয় করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, হক্ব কথাকে (দ্বীনকে) সমর্থন জানিয়েছে' *(আল-লায়ল, ৯২/৫-৬)*।[২]

তাক্বদীর অস্বীকারকারী দলসমূহ :

তাক্বদীর সম্পর্কে সঠিক বুঝ ও ধারণা না থাকার কারণে তিনটি দল পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (১) ক্বাদারিয়া (২) মুরজিয়া ও (৩) জাবারিয়া। এই দলগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে ক্বাদারিয়ারা নাস্তিকতার চাদরে আবৃত হয়েছে এবং মুরজিয়া ও জাবারিয়ারা বাউলবাদের চাদরে আবৃত হয়েছে। তাদের নিকট ভাগ্য বলতে কিছু নেই, বান্দা নিজের কাজ নিজেই করে, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। গান-বাজনা, মদ, তামাক জুয়া প্রভৃতি অপকর্ম তাদের নিকট সবই বৈধ; হারাম বলতে তাদের নিকট কিছুই নেই। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জোর গলায় নাস্তিক ও বাউলরা তাদের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। আর এ কাজে বস্তুবাদী মতবাদে বিশ্বাসী একটি দল পেছন থেকে তাদের মদদ দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ পড়ছে বিপাকে। এ দিকে বাউলরা বলছে, গান-বাজনা, মদ ও জুয়া বৈধ আর ঐ দিকে হুজুররা বলছে অবৈধ। এখন সাধারণ মানুষ যাবে কোন পথে? সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা একটু কুরআনের অর্থ ও হাদীছ পড়ুন, তাহলেই কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, তা আপনাদের সামনে পরিস্ফুটিত হবে। কোনো মানুষের জাদুমাখা বা রসাত্মক কথায় প্রতারিত হবেন না; বরং নিজ জ্ঞান দিয়ে যাচাই-বাছাই করুন।

তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি :

যারাই ইসলামের কোনো বিধানের বিরোধিতা বা অস্বীকার করবে, তাদের শেষ পরিণতি হবে মন্দ। ইসলামের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেনি, আর পারবেও না। যারা তাক্বদীর অস্বীকার করবে, তাদের পরিণতি কেমন হবে নিম্নের

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

[১] ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪; মিশকাত, হা/৬৬।

[২] ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬২; তিরমিযী, হা/৩৩৪৪; মিশকাত, হা/৮৫।

হাদীছগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ 'ক্বাদারিয়ারা হচ্ছে এ **উম্মতের** মাজূসী (অগ্নি পূজক)। তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না আর যদি মারা যায়, তবে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না'।[৩]

দেখুন, এই হাদীছে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কত কঠোর কথা বলেছেন। মানুষের জীবনের সর্বশেষ যে ছালাত (জানাযার ছালাত) সেটাতেও উপস্থিত হতে নিষেধ করেন। এত কোমল হৃদয়ের নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কত কঠোর হয়ে গেলেন। বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, তাক্বদীর অস্বীকার করা কত মারাত্মক অপরাধ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'আমার **উম্মতের** মধ্যেও '**খাসফ**' (জমিন ধ্বসিয়ে বা অদৃশ্য করে দেওয়া) এবং '**মাসখ**' (চেহারা বা আকার পরিবর্তন করে দেওয়ার) মতো শাস্তি হবে। তবে এ শাস্তি তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসকারীদের মধ্যেই হবে।[৪] আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদীদেরকে আকৃতি পরিবর্তন করে শাস্তি দিয়েছিলেন, কারণ তারা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। এই উম্মতের মাঝেও আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে; আর এই শাস্তি আপতিত হবে তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের উপর। আমরা এই ধরনের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ আকৃতি পরিবর্তন করবেন এর অর্থ দুটি হতে পারে। সত্যি সত্যিই আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা মন-মানসিকতা ও মস্তিষ্ক পরিবর্তন হয়ে যাবে। আপনি কি দেখেন না যে, নাস্তিকরা ও বাউলরা কেমন গাঁজাখুরি কথাবার্তা বলে? নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গানের তালে **উন্মাদের** মতো কীভাবে নাচে? মন-মানসিকতার যদি বিকৃতি না ঘটতো, তাহলে এমন কাজ কি কেউ করতে পারে?

وَعَن نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّه بَلَغَنِي أَنَّه قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ.

নাফে' রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক লোক ছাহাবী ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর নিকট এসে বলল, অমুক লোক আপনাকে সালাম দিয়েছে। উত্তরে ইবনু উমার বললেন, আমি শুনেছি সে নাকি দ্বীনের মধ্যে নতুন মত তৈরি করেছে (অর্থাৎ তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাস করেছে)। যদি প্রকৃতপক্ষে সে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করে থাকে, তাহলে আমার পক্ষ হতে তাকে কোনো সালাম পৌঁছাবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার **উম্মতের** অথবা এ **উম্মতের** মধ্যে জমিনে ধ্বসে যাওয়া, চেহারা বিকৃত রূপ ধারণ করা, শিলা পাথর বর্ষণের মতো আল্লাহর কঠিন আযাব পতিত হবে, তাদের উপর যারা তাক্বদীরের প্রতি অস্বীকারকারী হবে।[৫]

আমরা জানি আকৃতি বিকৃতির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ইয়াহূদীদেরকে। কারণ তারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে লঙ্ঘন করেছিল। এই **উম্মতের** মাঝেও এ ধরনের শাস্তি আপতিত হবে; আর এটা হবে তাক্বদীর অস্বীকার করার কারণে।

হে রাসূলের সৈনিক! সর্বদা চোখ-কান খোলা রাখবে। শয়তান ঈমান নামক গুপ্তধন লুণ্ঠন করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। তোমার একটু **উদাসিনতার** সুযোগে ঈমান নামক পথ চলার জ্যোতি হরণ করে নিয়ে চলে যাবে। সাবধান হও! তুমি অগ্রসর হও সব বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে। তোমাকে যে ঈমানী যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে; শয়তানের প্ররোচনায় প্রবঞ্চিত হলে চলবে না। মেঘের ঘনঘটা দেখে ভয় পাবে না; মনে রাখবে, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে মেঘের ঘনঘটা নিমিষেই দূরীভূত হয়ে যাবে। ঐ মানুষরূপী শয়তান, আর কতকাল ঘাতক হয়ে থাকবে? মানুষের ঈমান নিয়ে কেন ছিনিমিনি খেলছ? তোমার মৃত্যু তো সামনে অবধারিত। এখনও সময় আছে, বেলা ফুরাবার আগে গন্তব্যে চলে এসো, নচেৎ রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। কেউ তোমাদের নাম কোনো দিন উচ্চারণ করবে না। একটি আয়াত উল্লেখ করে লেখার যবনিকাপাত করছি, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 'যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই' (আত-তওবা, ৯/১১)।

---

[৩] আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯১; জামেউছ ছাগীর, হা/৭৮৯২; মিশকাত, হা/১০৭।

[৪] তিরমিযী, হা/২১৫৩; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৬২; মিশকাত, হা/১০৬।

[৫] তিরমিযী, হা/২১৫২; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৬১; মিশকাত, হা/১১৬।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রামাযান ও ঈদ

*-ওবায়দুল বারী**

ভূমিকা :

রামাযান মাস মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মাস। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ‘রামাযান হলো এমন মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ‘নিশ্চয় আমরা কুরআন একটি বরকতপূর্ণ রজনিতে অবতীর্ণ করেছি’ *(আদ-দুখান, ৪৪/৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ‘নিশ্চয় আমরা কুরআনকে ‘লায়লাতুল ক্বদর’ বা ভাগ্য রজনিতে অবতীর্ণ করেছি’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। এ মাসেই রয়েছে মহিমান্বিত ও ফযীলতপূর্ণ রজনি ‘লায়লাতুল ক্বদর’ বা ভাগ্য রজনি। যে রজনিতে ইবাদত করাকে আল্লাহ হাজার মাস ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ‘লায়লাতুল ক্বদর বা ভাগ্য রজনি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*। নিম্নে এই মাসের গুরুত্ব, ফযীলত, করণীয়-বর্জনীয়সমূহ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা পেশ করা হলো-

রামাযান মাসের বিশেষ ফযীলত : কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মাসের বিভিন্ন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসকে বরকতপূর্ণ মাস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, (রামাযান মাস আসলে) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে এ বলে সু-সংবাদ দিতেন যে, তোমাদের সামনে রামাযান মাস উপস্থিত, যা বরকতপূর্ণ মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর রামাযানের ছিয়ামকে ফরয করেছেন’।[১]

(২) রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ‘যখন রামাযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়’।[২]

(৩) অপর এক হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ‘যখন রামাযান মাসের প্রথম রজনি হয়, তখন আল্লাহ শয়তান এবং অবাধ্য জিনদের শৃঙ্খলিত করে রাখেন এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে রাখেন। তাই (রামাযান মাসে) জাহান্নামের কোনো দরজা খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন। তাই জান্নাতের কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না’।[৩]

(৪) রামাযান মাসে আসমানের দ্বারসমূহ বান্দার জন্য উন্মোচন করা হয়। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ‘যখন রামাযান মাস আসে, তখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়’।[৪]

(৫) রামাযান মাসে আল্লাহর রহমতের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করে দেন। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ‘যখন রামাযান মাস আসে, তখন রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়’।[৫]

(৬) রামাযানের ছিয়াম আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ‘যদি ছায়েম কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে এক রামাযান পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়’।[৬]

(৭) প্রতিদিন ইফতারের সময় অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন ইফতারের সময় অসংখ্য মানুষকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন’।[৭]

(৮) রামাযান মাস ‘ছবর’ বা ধৈর্যধারণের মাস। ছবর করা মুমিনের অন্যতম গুণ। ধৈর্যধারণ করার অনেক ফযীলত রয়েছে।

---

* অধ্যাপক, নারায়ণগঞ্জ কলেজ।

[১] সুনানে নাসাঈ, হা/২১০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭১৪৮; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/৮৮৬৭, হাদীছ ছহীহ।

[২] ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯।

[৩] সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২, হাদীছ ছহীহ।

[৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯।

[৫] ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯।

[৬] ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩।

[৭] সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪৩, হাদীছ ছহীহ।

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। এর মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায়। রামাযান মাসে সামনে খাদ্য-খাবার, লোভনীয় আইটেমের উপস্থিতি, প্রবৃত্তির তাড়না সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সত্যিই ধৈর্যের অনুশীলনের এটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

(৯) এ মাস কল্যাণ সন্ধানের মাস। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ‘একজন (ফেরেশতা) ঘোষণা করতে থাকেন, হে সৎকাজে আগ্রহী, অগ্রসর হও। হে অন্যায় কাজে আগ্রহী, ক্ষান্ত হও’।[৮]

এ ছাড়াও রামাযানের ফযীলতের ব্যাপারে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

রামাযানের ছিয়াম :

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের অন্যতম রুকন হলো ছিয়াম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল’ এই সাক্ষ্য প্রদান করা, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা ও রামাযানের ছিয়াম রাখা’।[৯]

তাই এক দিকে রামাযানের ছিয়াম যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন, অপরদিকে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার উপর ফরয বা আবশ্যকীয় বিধান। আল্লাহ তাআলা সুস্থ, সবল, মুক্বীমের উপর ছিয়াম রাখা ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে রামাযান মাস পায়, সে যেন রামাযান মাসের ছিয়াম রাখে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা :

(১) ছিয়াম রাখার মাধ্যমে একজন ছায়েম আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয় মানুষ ও মুত্তাক্বী হতে পারে : সূরা আল-বাক্বারার ২৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়াবান হতে পারো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ‘নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরুকে ভালোবাসেন’ *(আত-তওবা, ৯/৭)*।

(২) ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ দুটি খুশীর সময় : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ‘ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি খুশীর সময়: ইফতারের সময় এবং তার প্রতিপালকের নিকট ছিয়ামের বিনিময় প্রাপ্তির সময়’।[১০]

(৩) ছিয়াম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত প্রিয় : সারাদিন না খেয়ে থাকার কারণে ছিয়াম পালনকারীর মুখে যে গন্ধ সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ‘শপথ ঐ সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরির সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়’।[১১]

(৪) ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি ও বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘ঈমানের সহিত আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় যে ছিয়াম রাখে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’।[১২] অন্য এক হাদীছে এসেছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় রামাযানের ছিয়াম রাখবে এবং (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণ করবে, সে ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় যাবতীয় গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে যাবে’।[১৩] তাছাড়া অন্যান্য আমলের থেকে ছিয়াম পালনকারীর রয়েছে বিশেষ ফযীলত। ছিয়াম পালনকারীর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিজেই দেওয়ার কথা বলেছেন, يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى الصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ‘আমাকে রাযী-খুশী করার জন্য ছিয়াম পালনকারী পানাহার ও যৌন চাহিদা পরিহার করেছে। সুতরাং ছিয়াম আমারই জন্য। তাই এর প্রতিদানও আমিই দিব’।[১৪]

---

৮. সুনানে তিরমিযী, হা/৬৮২; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯-২২।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৭।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪।

১৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২২০১; মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা, হা/৮৬৩।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪।

(৫) ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে জান্নাতের বিশেষ দরজা : আল্লাহ তাআলা তার অনেক প্রিয় বান্দার জন্য জান্নাত তৈরি করেছেন। আর আল্লাহ তাআলার তৈরিকৃত জান্নাতের একটি বিশেষ প্রবেশদ্বার ছিয়াম পালনকারীর জন্য নির্বাচন করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ 'নিশ্চয় জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। কিয়ামতের দিন তা দিয়ে ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করবেন। ছিয়াম পালনকারীদের সাথে ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, ছিয়াম পালনকারীগণ কোথায়? তখন ছিয়াম পালনকারীগণ উক্ত প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবেন। অতঃপর যখন সর্বশেষ ছিয়াম পালনকারী প্রবেশ করবেন, তখন উক্ত প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কেউ উক্ত প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১৫]

(৬) ছিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ : দুনিয়াতে একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতা হলো, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া বা জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করা। ছিয়াম এমন একটি ইবাদত, যে ইবাদতের মধ্যে যেমনভাবে জান্নাতপ্রাপ্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তেমনভাবে ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছিয়াম জাহান্নাম থেকে মুক্তির বর্ণনা এসেছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ 'ঢাল তোমাদের যেমনভাবে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তেমনভাবে ছিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ'।[১৬] অপর এক হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ 'ছিয়াম জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ঢাল ও মযবূত দুর্গের সমতুল্য'।[১৭]

ছিয়াম অবস্থায় বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

ছিয়ামের উক্ত ফযীলতসমূহ পেতে হলে ছিয়াম পালনকারীকে কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক বিষয় এমন আছে যা করলে ছিয়ামের প্রতিদান এবং ফযীলত শূন্য হয়ে যায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ 'অনেক ছিয়াম পালনকারী এমন রয়েছে, ছিয়াম পালন করে যাদের ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত কিছুই হাছিল হয় না। অনেক ক্বিয়ামুল লাইলকারী এমন রয়েছে, যাদের রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কোনো প্রতিদান পায় না'।[১৮]

(১) যাবতীয় মন্দ কথা ও কাজ পরিহার করা : এ প্রসঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 'যে ব্যক্তি ছিয়াম রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকবে না, তার সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকার আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই'।[১৯]

(২) যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা : ঝগড়া-বিবাদ শুধু মানুষের সম্পর্ক এবং পরিবেশকেই নষ্ট করে না, বরং তা আমলের প্রতিদানকেও নষ্ট করে দেয়। তাই প্রত্যেক ছিয়াম পালনকারীর জন্য অপরিহার্য যে, কখনোই সে উক্ত জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়বে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ 'যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি ছিয়াম রাখে, তখন সে যেন কোনো অশ্লীল কথাবার্তা বা ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে গালি দেয়, তাহলে সে (ছিয়াম পালনকারী) যেন (তার উত্তরে গালি না দেয় বরং সে বলে) আমি ছিয়াম পালনকারী'।[২০]

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর :

'ছাদাক্বা' অর্থ 'দান', 'ফিত্বর' মানে 'ছিয়াম সমাপন'। ছাদাক্বাতুল ফিত্বর অর্থ হলো 'ছিয়াম শেষে ঈদুল ফিত্বরের দিনে সকালে প্রদেয় নির্ধারিত ছাদাক্বা'। এর মাধ্যমে ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা হয়। গরীব মানুষ ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারে।[২১] এই ছাদাক্বা ঈদের ছালাতের আগেই আদায় করতে হয়।[২২] ফিত্বরা কোনো দেশের প্রধান খাদ্যসামগ্রী দ্বারাই আদায় করতে

---

১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫২।

১৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৮৯১, ২১২৫; ইবনু হিব্বান, হা/৩৬৪৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬২৭৩, ১৬২৭৮, ১৭৯০২, ১৭৯০৯; সুনানে নাসাঈ, হা/২২৩০,২২৩১; মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/৮৮৯১; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৯।

১৭. মুসনাদে আহমাদ, হা/৯২২৫।

১৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৬৫৫১; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৪৮১; সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/১৬৯০।

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪।

২০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১১৫।

২১. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, হাদীছ ছহীহ।

২২. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/১৮১৫।

হবে। কেননা হাদীছে 'খাদ্যদ্রব্য' এর কথাই এসেছে।[২৩] এদেশে প্রচলিত টাকায় ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করা সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি নয়। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য যেহেতু চাল, তাই এদেশে চাল দ্বারাই ছাদাক্বাতুল ফিত্বরা আদায় করাই সুন্নাত।

কারা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর দেবেন এবং কাদের দেবেন? ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস সকলকে ফিত্বরা দিতে হবে।[২৪] অসহায় গরীব, ফক্বীর, মিসকীনরাই ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের হক্বদার। যাকাতের আট খাতের অন্যান্যরা ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের হক্বদার নয়।[২৫]

ঈদুল ফিত্বর প্রসঙ্গ :

ইসলামী শরীআতে মুসলিমদের জন্য আয়োজন বছরে দু'টি ঈদের। একটি হলো, শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে পালিত ঈদুল ফিত্বর।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মাক্কী জীবনে তেমন কোনো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদযাপনের সুযোগ মোটেও ছিল না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মুসলিমদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠার সুযোগটি প্রথম এসেছিল। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মাধ্যমে মুসলিমদের জাতীয় উৎসব পালনের অনুমতি প্রদান করেন। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দু'টি আনন্দ উৎসব আয়োজন করত। তাতে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করতো। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এ দু'টি দিনের বিশেষত্ব কী?' তারা উত্তর দিলেন, 'আমরা জাহেলী যুগে এই দুই দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করতাম। (আর সে ধারা এখনো অব্যাহত আছে)' তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের আনন্দ উদযাপনের জন্য এই দুই দিনের পরিবর্তে উত্তম অন্য দু'টি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার একটি হলো ঈদুল ফিত্বর আর অপরটি ঈদুল আযহা।[২৬]

ঈদুল ফিত্বরের দিন ইসলামী শরীআত মুসলিমদের উপর ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আবূ উবায়দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'একবার এক ঈদুল আযহার দিনে আমি উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি ছালাত দিয়ে ঈদের দিনের আমল শুরু করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তিনি তাঁর খুৎবায় বললেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এ দুই দিনের ছিয়াম নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিত্বরের দিন, সেটা তো তোমাদের ছিয়াম ভঙ্গ করার দিন। আর ঈদুল আযহার দিনে তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাবে'।[২৭]

ছালাতুল ঈদ :

ঈদের আনন্দের আরো একটি বড় উপাদান হলো ছালাতুল ঈদ। ঈদের দিন প্রথম প্রহরে এলাকার সকল মানুষ উন্মুক্ত ময়দানে সমবেত হয়ে একই ইমামের পেছনে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, সাদা-কালো নির্বিশেষে একই কাতারে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মানবিক ঐক্য আর সাম্য-মৈত্রীর যে মহিমা ফুটে উঠে, সত্যিই তা বড় আনন্দের!

জাতীয় উৎসবে সবকিছুর আগে সম্মিলিতভাবে খোলা মাঠে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায়ের পবিত্র দৃশ্য মহান আল্লাহ খুবই ভালোবাসেন। তাইতো তিনি ঈদগাহে সমবেত মুছল্লীদের দেখিয়ে ফেরেশতাদের বলতে থাকেন, 'দেখো আমার ফেরেশতারা! আমার বান্দাগণ তাদের উপর আমার বিধান (রামাযান মাসের ছিয়াম) পালন শেষে আমার বড়ত্ব বর্ণনা করতে করতে প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়েছে। আমার বড়ত্ব আর মহত্বের শপথ! আমি তাদের সব প্রার্থনা মঞ্জুর করব'। অতঃপর মহান আল্লাহ সমবেত সকল মুছল্লীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা ফিরে যাও, আমি তোমাদের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এবং তোমাদের পাপসমূহ পুণ্য দিয়ে বদলিয়ে দিয়েছি'।[২৮]

বছর ঘুরে আসা ঈদুল ফিত্বরের দিনটি হোক ধনী-গরীব সকল মুসলিমদের আনন্দ-উৎসবের দিন। বৈষয়িক আনন্দে পূর্ণ হোক আল্লাহর আনুগত্যের নির্মল ধারায় ঈদুল ফিত্বরের দিনটি। আর ঈদের দিনে 'ঈদ মোবারক' না বলে এক মুমিন আরেক মুমিনকে বলুন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম'।

---

[২৩] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫; মিশকাত, হা/১৮১৬।

[২৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/১৮১৫।

[২৫] আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, হাদীছ ছহীহ।

[২৬] সুনানে আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, হা/১০৯১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৬২২।

[২৭] আবূ দাঊদ, হা/২৪১৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৯৫৯; আস-সুনানুল কুবরা, হা/৮২৪৯।

[২৮] বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৩৪৪৪; ফাযায়েলুল আওক্বাত, হা/১৫৫; আহাদীছুল কুদসিয়্যা, হা/১৬৮।

ক্বদরের রাত কোনটি?

*-মাক্বছুদুর রহমান**

রামাযান আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস। অফুরন্ত ছওয়াব ও অধিক কল্যাণে পরিপূর্ণ এ মাস। এ উম্মতের জন্য এই মাস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিষেশ নিয়ামত ও রহমত। এ মাসে লায়লাতুল ক্বদর রাতের বরকত ও কল্যাণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

‘আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমি রাসূল প্রেরণকারী। আপনার প্রতিপালকের রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ *(আদ-দুখান, ৪৪/৩-৬)*।

মহান আল্লাহ এ রাতকে বরকতময় করেছেন। তাই এ রাত কল্যাণ, বরকত ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ। আল-কুরআনের অবতরণই এ রাতকে মহিমান্বিত করেছে। এ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মানুষের রিযিক্ব, বয়সসীমা, ভালো ও মন্দ সবকিছু এ রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

‘নিশ্চয় আমি ক্বদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি। আর আপনি কি জানেন, ক্বদরের রাত কী? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ সকল বিষয়ের (সিদ্ধান্ত) নিয়ে তাদের রবের অনুমতিক্রমে নাযিল হন। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে রাত শান্তিময় থাকে *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

কিন্তু কোনটি ক্বদরের রাত, তা নির্ধারণে আলেমগণের মধ্যে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘লায়লাতুল ক্বদর নির্ধারণে আলেমগণ ব্যাপক মতপর্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের নিকট আলেমগণের চল্লিশেরও অধিক মতামত রয়েছে’।[1]

তিনি ৪৬টি মত উল্লেখ করে বলেছেন, ‘এই মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মত হলো শেষ দশকের যে কোন বিজোড় রাত্রি হলো লায়লাতুল ক্বদর। তবে এই রাতটি স্থানান্তরিত হতে থাকে, যেমনটি এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো থেকে জানা যায়। শেষ দশকের বিজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি’।[2] আবার শেষ দশকের জোড় রাতগুলোতেও হওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে কম নয়। দলীলগুলোর পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

বিজোড় রাতগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর হওয়ার দলীল :

১. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ [ص:٤٧] انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً.

‘আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের মাঝের দশকে ই‘তিকাফ করতেন। ২০ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় এবং ২১ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যারা ই‘তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ই‘তিকাফ করেন, ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ,

---

* শিক্ষক, মাদ্রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ, রাণীবাজার, রাজশাহী।

[1] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ, ফাতহুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী (আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত সন-তারিখবিহীন), ৪/২৬২, হা/২০২২-এর ভাষ্য।

[2] প্রাগুক্ত, ৪/২৬৬।

তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন। অতঃপর বলেন, আমি এই দশকে ই‘তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শেষ দশকে ই‘তিকাফ করব। যে আমার সঙ্গে ই‘তিকাফ করেছিল, সে যেন তার ই‘তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন,) শেষ দশকে ঐ রাতের তালাশ করো এবং প্রত্যেক বিজোড় রাতে তা তালাশ করো। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে আল্লাহর ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল ২১ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের ছালাত শেষে ফিরে বসেন, তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা’।[৩]

২. আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো’।[৪]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ ‘আমাকে ক্বদরের রাত দেখানো হয়েছিল। তারপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে ওই রাতের ভোর সম্পর্কে স্বপ্নে আরও দেখানো হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি’। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তেইশতম রাতে বৃষ্টি হলো এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে (ফজরের) ছালাত আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তাঁর কপালে কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম’।[৫]

জোড় রাত্রে লায়লাতুল ক্বদর হওয়ার দলীলসমূহ :

১. ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ‘তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে, অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে’। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ‘তোমরা (লায়লাতুল ক্বদর) ২৪তম রাতে তালাশ করো’।[৬]

২. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ.

‘হে লোক সকল! আমাকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়েছিরাম, কিন্তু দুই জন ব্যক্তি ঝগড়ারত অবস্থায় উপস্থিত হলো আর তাদের সাথে শয়তান ছিল, ফলে আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রামাযান মাসের শেষ ১০ দিনে অন্বেষণ করো। তোমরা তা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাতে অন্বেষণ করো’। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ সাঈদ! আপনি সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক জানি। আমি বললাম ৯ম, ৭ম, ৫ম সংখ্যাগুলো কী? তিনি বললেন, ‘যখন ২১তম রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ২২তম রাত শুরু হয় তখন তা হচ্ছে ৯ম তারিখ, ২৩তম রাত অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী রাত হচ্ছে ৭ম তারিখ এবং ২৫তম রাত অতিবাহিত হবার পরের রাতটি হচ্ছে ৫ম তারিখ’।[৭] অর্থাৎ এই হাদীছে বর্ণিত রাতগুলো হলো বাইশ, চব্বিশ ও ছাব্বিশ তারিখ।

৩. শেষ দশক লায়লাতুল ক্বদর: শেষ দশকের যে কোন দিন লায়লাতুল ক্বদর হতে পারে। জোড় কিংবা বিজোড় কোনোটিকে নির্দিষ্ট না করে বেশ কিছু রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সাধারণভাবে শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করার কথা বলা হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো’।[৮]

---

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৮।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০২২।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২০২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৯।

তবে বিজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে ২৭শ তারিখের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করা যায়। ইবনু হুবাইস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أُبَيٌّ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا.

যখন উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বলা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে ছালাত আদায় করবে, সে লায়লাতুল ক্বদর পাবে'। তখন তিনি বললেন, 'যিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, সেই মহান আল্লাহর কসম! নিশ্চিতভাবে লায়লাতুল ক্বদর রামাযান মাসে। এ কথা বলে তিনি কসম করলেন কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ' বললেন না (অর্থাৎ তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতেন যে, রামাযান মাসেই লায়লাতুল ক্বদর আছে)'। এরপর তিনি আবার বললেন, 'আল্লাহর কসম! কোন রাতটি ক্বদরের রাত তাও আমি জানি। সেটি হলো সেই রাত, যে রাতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের ছালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। ২৭শে রামাযান দিন শুরুর পূর্বে যে রাত সেই রাত সেটি। আর ওই রাতের নিদর্শন হলো, সে রাত শেষে সকালে যে সূর্য উদিত হবে, তা উজ্জ্বল হবে কিন্তু (উদয়ের) সময় তার কোনো তীর্যক আলোকরশ্মি থাকবে না (অর্থাৎ, অন্য দিনের তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হবে)'।[৯]

মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ২৭শের রাতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো'।[১০]

আবার শেষ দশকের শেষ সাত দিনে লায়লাতুল ক্বদর সংঘটিত হওয়া অধিক প্রত্যাশিত বিষয়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত,

أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় ছাহাবীকে রামাযানের শেষের সাত রাতে লায়লাতুল ক্বদর স্বপ্নে দেখানো হয়। (এ শুনে) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান করবে, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে'।[১১]

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ২৭শের রাতই লায়লাতুল ক্বদর বা শেষ সাত দিনেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে অথবা কেবল বিজোড় রাতে অনুসন্ধান করলেই এই রাত পাওয়া যাবে, বরং শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করতে হবে। এমনটিই বুঝেছেন ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা, ইমাম ইবনু বায, ইমাম ইবনু উছায়মীন প্রমুখ বিদ্বানগণ রাহিমাহুমুল্লাহ। তাদের গবেষণালব্ধ ফৎওয়ার অনুবাদ-

ফৎওয়া-১ : ৮ম হিজরীর অবিস্মরণীয় মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম তাক্বীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম ইবনু তায়মিয়্যা আল-হাররানী আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.)-কে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'লায়লাতুল ক্বদর রামাযান মাসের শেষ দশকে রয়েছে। বিশুদ্ধ সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এই রাত রামাযান মাসের শেষ দশকে রয়েছে। এটা শেষ দশকের বিজোড় রাতেও হতে পারে। কিন্তু বিজোড় (রাত) গত হয়ে যাওয়ার পরও হতে পারে। তখন তুমি লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করবে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলোতে।[১২]

আবার বিজোড় (রাত) অবশিষ্ট থাকার বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। যেমনটি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশিষ্ট নবম, সপ্তম, পঞ্চম ও তৃতীয় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করো।[১৩]

---

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬২।

১০. ছহীহুল জামে', হা/১২৪০, সনদ ছহীহ।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৫।

১২. অর্থাৎ, শুরু থেকে এই দশকের রাতগুলো অতিবাহিত বা গত হওয়ার ভিত্তিতে শুরু হবে এই বিজোড় রাতের গণনা। যেমন, এই দশকের প্রথম রাত ২১তম। এই রাত থেকে বিজোড় গণনা শুরু হবে। এভাবে হবে ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলোও। -লেখক

১৩. অর্থাৎ, শেষ দশক শুরু হলে অবশিষ্ট রাতগুলো হয় শেষের দিকে। অর্থাৎ, ৩০ বা ২৯তম রাত থেকে ২১তম রাত পর্যন্ত। সুতরাং এই বিবেচনায় বিজোড় গণনা শুরু হবে শেষের দিক থেকে। শেষের দিক থেকে বিজোড় গণনা করলে হয়, অবশিষ্ট ১ম রাত্রি হলো ৩০তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৩য় রাত্রি হলো ২৮তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৫ম রাত্রি হলো ২৬তম রাত্রি, অবশিষ্ট ৭ম রাত্রি হলো ২৪তম রাত্রি, আর অবশিষ্ট ৯ম রাত্রি হলো ২২তম রাত্রি। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। -লেখক

এর উপর ভিত্তি করে মাস যখন ৩০ হবে, তখন পূর্বোক্ত রাতগুলো (অর্থাৎ, গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলো) জোড় রাত্রি হবে। তখন ২২তম রাতটি হবে অবশিষ্ট ৯ম রাত্রি এবং ২৪তম রাতটি হবে অবশিষ্ট ৭ম রাত্রি। বিশুদ্ধ হাদীছে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু।[১৪] আর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবেই রামাযান মাসে শেষ দশক সম্পন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে মাস যদি ২৯শে হয়, তবে যে তারিখ অবশিষ্ট থাকার বিবেচনায় হয়েছে, তা গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় যে তারিখ তার মতো হবে।[১৫]

বিষয়টি যখন এমনই, তখন মুমিনের উচিত পুরো শেষ দশকেই ওই রাত তালাশ করা। যেমনটি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ওই রাতটি শেষ দশকে তালাশ করো'।[১৬] তবে ওই রাতটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শেষ সাতটি রাতের মধ্যে হয়ে থাকে। তবে ২৭শের রাতে লায়লাতুল ক্বদর বেশি হয়ে থাকে। যেমন, ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হলফ করে বলেছেন যে, ওই রাতটি হলো ২৭শের রাত। তাকে বলা হলো, কীসের মাধ্যমে আপনি এটা জেনেছেন? তিনি বললেন, নিদর্শনের মাধ্যমে, যে নিদর্শনের ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, ওই দিন সকালে সূর্য উদিত হবে, সেদিন সকালের সূর্যটা হবে একটা প্লেটের মতো, আর তার কোনো কিরণ থাকবে না। এই নিদর্শনটি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেছেন। এটা হাদীছে বর্ণিত প্রসিদ্ধ নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিদর্শনের বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই ঐ রাতের ঊষার আলো অনেক উজ্জ্বল হবে'। এই রাতটি হবে প্রশান্তিদায়ক রাত; না হবে খুব গরম, আর না হবে খুব ঠাণ্ডা। কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো কোনো ব্যক্তিকে ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় এই রাতটি সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারেন। সে হয়ত তখন এর আলো দেখবে বা কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, যে তাকে বলছে, এটা হলো ক্বদরের রাত। আল্লাহ তাকে এই রাতটি প্রত্যক্ষ করার জন্য তার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিবেন, যার মাধ্যমে তার কাছে প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।[১৭]

ফৎওয়া-২ : সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী যুগশ্রেষ্ঠ ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ ইমাম আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.) বলেছেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের শেষ দশকে রয়েছে। আর তা বিজোড় রাতগুলোর কোনো একটিতে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তা রামাযানের শেষ দশকের, বিজোড় রাতে অনুসন্ধান কর'।[১৮]

একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, ওই রাতটি শেষ দশকের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে থাকে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট এক রাতে হয় না। তাই তা কখনো ২১শের রাতে, কখনো ২৩শের রাতে, কখনো ২৫শের রাতে, কখনো ২৭শের রাতে হতে পারে। তবে এই রাতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কখনো ২৯শের রাতে হতে পারে, আবার কখনো জোড় রাতগুলোতেও হতে পারে।

সুতরাং কেউ যদি শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে ঈমানের সাথে এবং ছওয়াবের আশায় ক্বিয়াম করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ওই রাতটি পেয়ে যাবে। আর আল্লাহ যে অঙ্গীকার এই রাতের অধিবাসীদের (যারা এই রাতে ক্বিয়াম করে) দিয়েছেন, তা লাভ করে সফলকাম হবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দশকের রাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইবাদত করতে যে অতিরিক্ত সাধনা করতেন, তা তিনি প্রথম ২০ রামাযানে করতেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেছেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করতে যে সাধনা করতেন, সে সাধনা তিনি অন্য সময় করতেন না'।[১৯]

তিনি আরও বলেছেন, 'রামাযানের শেষ দশক শুরু হবার সাথে সাথে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন। তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর সাধনা করতেন এবং লুঙ্গি কষে বাঁধতেন (ইবাদতে খুব সচেষ্ট থাকতেন)'।[২০+২১]

---

[১৪] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

[১৫] গত হয়ে যাওয়ার বিবেচনায় তারিখগুলো হয় ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাতগুলো। আর অবশিষ্ট থাকার বিবেচনায় ২৯শে মাস হলে শেষের দিক থেকে গণনা করতে হবে। তখনো তারিখগুলো বিজোড়ই হবে। অর্থাৎ ২৯, ২৭, ২৫, ২৩ ও ২১তম রাত হবে। -লেখক

[১৬] ছহীহ বুখারী, হা/২০২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৯।

[১৭] ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ, মাজমূঊ ফাতাওয়া (বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস, মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), ২৫/২৮৪-২৮৬।

[১৮] ছহীহ বুখারী, হা/২০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

[১৯] ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫।

[২০] ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৪।

[২১] ইমাম ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ, মাজমূঊ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাতুম মুতানাওয়্যাআহ (দারুল ক্বাসিম, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২১ হি.), ১৫/৪২৬-৪২৮।

ফৎওয়া-৩ : বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উছূলবিদ আশ-শায়খুল আল্লামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) বলেছেন, ‘লায়লাতুল ক্বদর নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমগণ চল্লিশেরও অধিক মত পেশ করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বুখারীর ব্যাখ্যায় মতগুলো উল্লেখ করেছেন। আর লায়লাতুল ক্বদরের ব্যাপারে আরও কিছু আলোচনা আছে।

১ম আলোচনা : লায়লাতুল ক্বদর কি এখনো অবশিষ্ট আছে, না-কি এটা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : বিশুদ্ধ মতানুসারে, কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা অবশিষ্ট আছে। আর যে হাদীছে এটা উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই বছরে নির্দিষ্টভাবে ওই রাতটি জানার ইলম তথা জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া। কেননা ওই বছর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাতটি দেখেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীবর্গকে এ ব্যাপারে জানানোর জন্য বের হন। তখন দুই ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল ফলে ওই বছরে নির্দিষ্টভাবে রাতটি সম্পর্কিত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল’।[২২]

২য় আলোচনা : এই রজনি কি রামাযান মাসে না-কি অন্য কোনো মাসে?

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই রজনি রামাযান মাসেই রয়েছে। এটা অনেক দলীলের আলোকে সাব্যস্ত। তার মধ্যে প্রথমত মহান আল্লাহর বাণী, ‘রামাযান সেই মাস, যেই মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রামাযান মাসে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রাতে’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। সুতরাং যখন তুমি এই আয়াতকে আগের ওই আয়াতের সাথে মিলাবে, তখন লায়লাতুল ক্বদর রামাযান মাসেই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এই রাত যদি রামাযান মাসে না হয়, তবে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, ‘রামাযান সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা হলো যৌক্তিক দলীল। আর যৌক্তিক দলীল হলো সেই দলীল, যাতে একটি দলীলকে আরেকটির সাথে না মিলানো পর্যন্ত তা থেকে ইস্তিদলাল (দলীল গ্রহণ করা) পূর্ণ হয় না। যৌক্তিক দলীলের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে একটি হলো, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল হচ্ছে ছয় মাস, যখন বাচ্চা জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এটা আমরা জেনেছি মহান আল্লাহর বাণী থেকে, ‘তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ৩০ মাস’ *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*। তিনি অন্যত্র বলেছেন, ‘তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে’ *(লুক্বমান, ৩১/১৪)*।

সুতরাং যখন আমরা ৩০ মাস থেকে দুই বছর বাদ দিব, তখন অবশিষ্ট থাকবে ছয় মাস। আর এটাই হলো গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল।

৩য় আলোচনা : রামাযানের কোন রাতে লায়লাতুল ক্বদর সংঘটিত হয়?

উত্তর : কুরআনে এই রাত নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, এই রাত রামাযানের শেষ দশকেই রয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের প্রথম দশকে ই‘তিকাফ করলেন। এরপর তিনি মাঝের দশকেও ই‘তিকাফ করলেন। অতপর শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদরের কথা তাঁকে অবহিত করা হলো আর ওই রাতটি তাঁকে স্বপ্নেও দেখানো হয়েছিল, যে রাতে তিনি কাদা ও পানির মধ্যে ফজরের (ছালাতের) সিজদা করছিলেন। সেটা ছিল রামাযানের ২১তম রাত। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই‘তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। সে রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে ছাদ থেকে মসজিদে পানি বর্ষিত হলো। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। তিনি তাঁর ছাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের ছালাত পড়লেন। তিনি যমীনের উপর সিজদা করলেন। (বর্ণনাকারী) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তিনি কাদা ও পানিতে সিজদা দিলেন। এমনকি আমি স্বচক্ষে তাঁর কপালে কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম।[২৩]

একদল ছাহাবী (রামাযানের) শেষ সাত রাতে লায়লাতুল ক্বদর প্রত্যক্ষ করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে’। অর্থাৎ, একই রকম হয়েছে। ‘অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান করবে, সে যেন শেষ সাত রাতে এর সন্ধান করে’। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, শেষ দশকের মধ্যে শেষ সাত রাত হলো বেশি প্রত্যাশিত। যদি না রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাটির দ্বারা এই উদ্দেশ্য

---

[২২] ছহীহ বুখারী, হা/২০২৩।

[২৩] ছহীহ বুখারী, হা/২০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

হয় যে, এটা কেবল সেই বছরের জন্যই নির্দিষ্ট- 'আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে'।[২৪]

এটি একটি সম্ভবনাময় বিষয়। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মৃত্যুঅবধি সম্পূর্ণ শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। সুতরাং এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁর কথা 'আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে'-এর অর্থ হলো, এটা সেই বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যে, শেষ সাত রাতের মধ্যেই লায়লাতুল ক্বদর নিহিত রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আগামী সব রামাযানে লায়লাতুল ক্বদর শেষ সাত রাতের মধ্যে থাকবে। বরং এই ভাগ্য রজনিটি শেষ দশকের পুরোটার মধ্যেই অবশিষ্ট থাকবে।

৪র্থ আলোচনা : প্রত্যেক বছর লায়লাতুল ক্বদর কি এক রাতেই হয়ে থাকে, না-কি এটা স্থানান্তরিত হয়?

উত্তর : এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এই রাতটি স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং কোনো বছর ২১তম রাত লায়লাতুল ক্বদর হতে পারে, আবার কোনো বছর ২৯তম রাত, কোনো বছর ২৫তম রাত, কোনো বছর ২৪তম রাত লায়লাতুল ক্বদর হতে পারে এবং অনুরূপভাবে (শেষ দশকের বাকি রাতগুলোতেও) হতে পারে। কেননা এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর অন্য কোনো সিদ্ধান্তের উপর এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। তবে অধিক সম্ভাবনাময় রাত হলো ২৭শের রাত। কিন্তু 'নির্দিষ্টভাবে এই রাতটিই লায়লাতুল ক্বদর নয়, যেমনটি কতিপয় লোক ধারণা করে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি তার ধারণার উপর ভিত্তি করে, এই একটি রাতেই অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করে এবং অন্যান্য রাতগুলোতে শিথিলতা প্রদর্শন করে। এই রাতটি (নির্দিষ্টভাবে একই রাতে না হয়ে, বিভিন্ন রাতে) স্থানান্তরিত হওয়ার পিছনে হিকমা এই যে, এই ভাগ্য রজনিটি যদি নির্দিষ্ট কোনো রাতে হতো, তবে অলস বান্দা এই একটি রাতে ক্বিয়াম করেই ক্ষান্ত হয়ে যেত। কিন্তু 'যখন রাতটি স্থানান্তরিত হবে এবং প্রতিটি রাতেই লয়লাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভবনা থাকবে, তখন ব্যক্তি পুরো শেষ দশকেই ক্বিয়াম করবে। এ ব্যাপারে আরো হিকমা এই যে, এতে অলসতা পরিহার করে এই রাত তালাশ করার ব্যাপারে আগ্রহী বান্দার জন্য রয়েছে পরীক্ষা'।[২৫] ইমাম ইবনু উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন, 'তবে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো অধিক সম্ভাবনাময়। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করো, আর তা প্রত্যেক বিজোড় রাতে তালাশ করো'।[২৬] শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো হলো ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯তম রাত। এই পাঁচটি রাত এই দশকের মধ্যে অধিক সম্ভাবনাময়। এর অর্থ এই নয় যে, লায়লাতুল ক্বদর কেবলমাত্র বিজোড় রাতেই সংঘটিত হয়। বরং এই রাতটি জোড়-বিজোড় উভয় রাতগুলোতে হতে পারে'।[২৭]

কিছু দূর এগিয়ে ইমাম ইবনু উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন, 'বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে ক্বদরের রাত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে ২৭তম রাত অন্যতম। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে ২৭তম রাতে লায়লাতুল ক্বদর হবে একথা বলা যাবে না'।[২৮]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে লায়লাতুল ক্বদর শেষ দশকের মধ্যে রয়েছে। তাই এই রাতটি পাওয়ার জন্য শেষ দশকের জোড়-বিজোড় সব রাতেই তালাশ করতে হবে। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমল এরকমই ছিল। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 'যখন রমযানের শেষ ১০ দিন আসত, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিধেয় বস্ত্রকে শক্ত করে বাঁধতেন, রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবার-পরিজনকে জাগাতেন'।[২৯] আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত।

---

২৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৫।

২৫. ইমাম ইবনু উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ, আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুস্তাক্বনি (দারু ইবনিল জাওযী, দাম্মাম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২৪ হি.), ৬/৪৮৯-৪৯২।

২৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

২৭. প্রাগুক্ত ৬/৪৯৪।

২৮. প্রাগুক্ত, ৬/৪৯৫।

২৯. ছহীহ বুখারী, 'রামাযানের শেষ দশকের আমল' অনুচ্ছেদ, হা/২০২৪।

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা

*-সাজ্জাদ সালাদীন**

ফিত্বরা (فِطْرَةٌ) আরবী শব্দ, যা ইসলামে যাকাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের যাকাত) বা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের ছাদাক্বা) নামে পরিচিত। ফিত্বর বা ফাতুর বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়, যা দ্বারা ছায়েমগণ ছিয়াম ভঙ্গ করেন।[১] আল্লাহ তাআলা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য আনন্দ ও খুশির দিন হিসাবে ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা নামক দুটি দিন নির্ধারণ করেছেন।

ঈদুল ফিত্বরের খুশির দিনে ধনীদের সাথে গরীবরাও যেন সমানভাবে আনন্দ ও খুশিতে শরীক হতে পারে, সেজন্য যাকাতুল ফিত্বর ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে, যে যাকাত আদায় করবে' *(আল-আ'লা, ৮৭/১৪)*। এখানে যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যাকাতুল ফিত্বর।[২] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন ছিয়াম আদায়কারীর অনর্থক কথা-কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রতাস্বরূপ এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থাস্বরূপ'।[৩]

যাকাতুল ফিত্বর ফরয হওয়ার শর্ত : যাকাতুল ফিত্বর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া কি শর্ত? না, যাকাতুল ফিত্বর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা যাকাতুল ফিত্বর ব্যক্তির উপর ফরয; মালের উপর ফরয নয়। মালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মালের কম-বেশির কারণে এর পরিমাণ কম-বেশি হবে না। এক্ষেত্রে শুধু ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, ঈদের দিন ভোরে কারও নিকট যদি যাকাতের নিছাব পরিমাণ সম্পদ তথা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তবেই তার উপরই ফিত্বরা আদায় করা ফরয। অথচ এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিমের উপর খেজুর অথবা যব হতে এক ছা' যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন।[৪] এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছোট ও ক্রীতদাসের উপরও যাকাতুল ফিত্বর ফরয বলে উল্লেখ করেছেন। যাকাতুল ফিত্বর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত হলে, ছোট ও ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা এখানে উল্লেখ থাকতো না। অথচ সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানও এখানে 'ছোট' এর অন্তর্ভুক্ত, যার নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। অনুরূপভাবে ক্রীতদাস সাধারণত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয করেননি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ব্যতীত ক্রীতদাসের উপর অন্য কোনো ছাদাক্বা (যাকাত) নেই'।[৫]

যাকাতুল ফিত্বর আদায় করার যিম্মাদার : প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে এবং যাদের খরচ বহন করা তার উপর ওয়াজিব, তাদের সবার যাকাতুল ফিত্বর আদায় করার যিম্মাদার তিনিই হবেন।

ফিত্বরার পরিমাণ : আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أقط أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ 'আমরা খাদ্য অথবা যব অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা কিশমিশ হতে এক ছা' পরিমাণ ছাদাকাতুল ফিত্বর বের করতাম'।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে, صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 'ফিত্বরা হচ্ছে এক ছা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য'।[৭] এই হাদীছে ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের পরিমাণ এক ছা' উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ছা' বলতে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় মদীনায় প্রচলিত ছা' উদ্দেশ্য। পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রচলিত যেকোনো ছা' যদি আল্লাহর রাসুল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত ছা'-এর বিপরীত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অর্ধ ছা' ফিত্বরা দেওয়া যাবে কি? বর্তমানে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে অর্ধ ছা' ফিত্বরা প্রদানের যে নিয়ম চালু রয়েছে, তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সর্বপ্রথম মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে শুধু গমের ক্ষেত্রে অর্ধ ছা' ফিত্বরা আদায়ের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। আর এটা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ, যা আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সহ অন্যান্য ছাহাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হাদীছটি নিম্নরূপ—

---

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

[১] আল-মু'জামুল আওসাত্ব, পৃ. ৬৯৪।

[২] তাফসীরে ত্বাবারী, সূরা আ'লার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[৩] আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, হাদীছ ছহীহ।

[৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/১৮১৫।

[৫] ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮২; মিশকাত, হা/১৭৯৫।

[৬] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫।

[৭] বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৭৭০৫

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় ছোট-বড়, স্বাধীন-ক্রীতদাস প্রত্যেকে খাদ্যদ্রব্য অথবা পনির অথবা যব অথবা খেজুর অথবা কিশমিশ হতে এক ছা‘ (পরিমাণ) ‘যাকাতুল ফিত্বর’ আদায় করতাম। আমাদের যাকাতুল ফিত্বর প্রদান পদ্ধতি এইভাবেই চলতে থাকে। মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু যখন হজ্জ বা উমরা উপলক্ষ্যে মদীনায় আসলেন। (তার সঙ্গে সিরিয়ার গমও এলো)। তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আমি মনে করি, সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা‘) গম (মূল্যের বিচারে) মদীনার এক ছা‘ খেজুরের সমতুল্য’। লোকজন তা গ্রহণ করে নিল। তখন আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বললেন, فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‘আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব, ততদিন (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যামানায়) যা দিতাম, তাই-ই দিয়ে যাব’।[৮] অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যমানায় যে এক ছা‘ আদায় করতাম, তা-ই করব; আধা ছা‘ ফেতরা আদায় করব না।

অর্ধ ছা‘ ফিত্বরা আদায় সম্পর্কে সালাফগণের মতামত :

১. একদা আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -কে যাকাতুল ফিত্বর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যমানায় খেজুর অথবা যব অথবা পনির হতে যে এক ছা‘ যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতাম, তা-ই করব। তখন গোত্রের কোনো এক ব্যক্তি বললেন, যদি অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা হয়? তিনি বললেন, لاَ تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا ‘না, এটা মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। আমি তা গ্রহণও করব না এবং তার উপর আমলও করব না’।[৯]

২. ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ... وَفِيْ صَنِيْعِ مُعَاوِيَةَ وَمُوَافَقَةِ النَّاسِ لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ مَحْمُوْدٌ لَكِنَّهُ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ فَاسد الإِعْتِبَارِ. ‘...মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -এর ইজতিহাদ এবং মানুষের তা গ্রহণ করার মাধ্যমে ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত হয়, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু যেখানে দলীল উপস্থিত, সেখানে ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়’।[১০]

৩. ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, وَلَيْسَ لِلْقَائِلَيْنِ بِنِصْفِ صَاعٍ حُجَّةٌ إِلَّا حَدِيْثَ مُعَاوِيَةَ ﷺ ‘অর্ধ ছা‘ গমের কথা যারা বলেন, তাদের মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -এর এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোনো দলীল নেই’।[১১]

অতএব, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, অর্ধ ছা‘ গম দ্বারা ফিত্বরা আদায় করা মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -এর নিজের ইজতিহাদ মাত্র; রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম - বর্ণিত কোনো হাদীছ নয়। আর দলীলের উপস্থিতিতে ‘ইজতিহাদ’ গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণী ও আমল অনুযায়ী এক ছা‘ খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিত্বরা আদায়ের উপর অটল থেকেছেন।

তাছাড়া হাদীছে যেসব খাদ্যদ্রব্যের নাম এসেছে, তার সবগুলোর মূল্য এক ছিল না, বরং মূল্যে পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও সকল খাদ্যদ্রব্য থেকে এক ছা‘ করে যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তার পরিমাণ বা ওজনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ছা‘-এর সংজ্ঞা ও পরিমাণ : আরবীতে ছা‘ (صاع) নির্দিষ্ট পরিমাপের একটি পাত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা শস্যজাতীয় খাদ্য পরিমাপ করা হয়। মাঝারি দেহের অধিকারী মানুষের দুই হাতের তালু একত্র করে চার অঞ্জলিতে যে পরিমাণ খাবার উঠে তাই এক ছা‘। এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যকে ওজন করা হলে মোটামুটি আড়াই কেজি হবে।[১২] ছা‘কে কিলোগ্রামের মাপে নেওয়া হলে শস্যভেদে ছা‘-এর পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে। যেমন ওজনের দিক থেকে চাউল ও গমের সমান নয়। তাই আড়াই কেজি কিংবা এর চেয়ে কিছু কম-বেশি যাকাতুল ফিত্বর হিসাবে আদায় করা কর্তব্য।

যা দিয়ে যাকাতুল ফিত্বর আদায় বৈধ : যাকাতুল ফিত্বরের পরিমাপের মত এর খাদ্যের ধরনও নির্ধারিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَدُّوْا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي الْفِطْرِ ‘তোমরা এক ‘ছা’ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা’ ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করো ।[১৩] আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ. ‘আমরা ত্ব‘আম (খাদ্য) অথবা যব অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা কিশমিশ হতে এক ‘ছা’ পরিমাণ যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতাম’।[১৪]

এই হাদীছে যাকাতুল ফিত্বর হিসাবে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের মানুষের সাধারণ খাদ্যের (ত্ব‘আমের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যা যেকোনো সময়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ খাদ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। হাদীছে তৎকালীন সময়ের কোনো খাদ্যকে নির্দিষ্ট না করে

---

[৮] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫।

[৯] ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৪১৯; মুসতাদরাক হাকেম, হা/১৪৯৫; ইরওয়াউল গালীল, ৩/৩৩৯।

[১০] ফাতহুল বারী, ৩/৩৭৪, হা/১৫০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[১১] ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ৩/৪৪৭, হা/৩৮৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[১২] তাযকীরু ইবাদির রহমান ফীমা অরাদা বিছিয়ামি শাহরি রামাযান, পৃ. ৩১; যাদুছ ছায়েম ওয়া ফাযলুল ক্বায়েম, পৃ. ২৯।

[১৩] ছহীহুল জামে‘, হা/২৪২; সিলসিলা ছহীহা, হা/১১৭৯।

[১৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫; মিশকাত, হা/১৮১৬।

‘ত্বআম’ বা সাধারণ খাদ্যের ব্যবহার করে যেকোনো সময়ের সাধারণ খাদ্যকে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসাবে প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ সরাসরি খাদ্য নয় এমন বস্তুকে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসাবে আদায় করতে না পারে। যেমন যবের উপর ধানকে ক্বিয়াস করা। কেননা যব খোসাসহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসাসহ পিষে খাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিত্বরা প্রদান করাই শরীআতসম্মত।

টাকা দিয়ে যাকাতুল ফিত্বর আদায়ের প্রচলন : টাকা দিয়ে ফিত্বরা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালি যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম টাকা দ্বারা ফিত্বরা আদায় করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিত্বরা আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণকে আদায় করতে বলেছেন। যার কারণে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের কথা হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, ‘আমরা ত্ব‘আম (খাদ্য) অথবা যব অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা কিশমিশ হতে এক ছা‘ পরিমাণ যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতাম’।[১৫]

অতএব, খাদ্যশস্য দ্বারা ‘যাকাতুল ফিত্বর’ আদায় করাই ইসলামী শরীআতের বিধান। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিত্বরা প্রদান করা ইসলামী শরীআতের পরিপন্থী বিষয়। ছায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিত্বরা আদায়ের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি অধিক ভালোবাসা নিহিত আছে।

যাকাতুল ফিত্বর আদায়ের সময় : রামাযান শেষে শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে ঈদের মাঠে গমনের পূর্ব পর্যন্ত যাকাতুল ফিত্বর আদায় করতে হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা বলেন, فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বাধীন-পরাধীন, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় প্রত্যেক মুসলিমের উপর খেজুর অথবা যবের এক ছা‘ যাকাতুল ফিত্বর ফরয (নির্ধারণ) করেছেন এবং ছালাতের উদ্দেশ্যে লোকেদের বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন’।[১৬]

যাকাতুল ফিত্বরের সর্বশেষ সময় : ঈদের ছালাত শুরু হলে যাকাতুল ফিত্বর আদায়ের সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব, যাকাতুল ফিত্বর ছালাতের পর আদায় করা বৈধ নয়। ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) ছিয়ামকে পবিত্র করা এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থা স্বরূপ। যে ব্যক্তি (ঈদের) ছালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারন দান হিসেবে গৃহীত হবে।[১৭]

উক্ত জমাকৃত যাকাতুল ফিত্বর ঈদের ছালাতের পরে হক্বদারদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِلْجَمْعِ لاَ لِلْفُقَرَاءِ ‘তারা জমা করার জন্য দিতেন, ফক্বীরদের মাঝে বণ্টন করার জন্য নয়’।[১৮]

সময় হওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায়ের বিধান : প্রয়োজনে এক অথবা দু’দিন পূর্ব থেকে যাকাতুল ফিত্বর আদায় করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু এর প্রমাণ পাওয়া যায়। كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ‘ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু জমাকারীদের নিকট ছাদাক্বাতুল ফিত্বর প্রদান করতেন। আর তারা ঈদুল ফিত্বরের একদিন অথবা দু’দিন পূর্বে তা আদায় করতেন’।[১৯] ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে আব্দুল ওয়ারেছের সূত্রে আইয়ূব থেকে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[২০] তাছাড়া আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -কে ফিত্বরার মাল পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[২১]

যাকাতুল ফিত্বর বণ্টনের খাত ও প্রকৃত হক্বদার : যাকাতুল ফিত্বর বণ্টনের খাত নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ছহীহ মতে, যাকাতুল ফিত্বর যাকাতের মতো নয়। ফক্বীর ও মিসকীনরাই যাকাতুল ফিত্বরের হক্বদার। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিত্বরকে طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ তথা ‘মিসকীনদের খাদ্যস্বরূপ’ বলে উল্লেখ করেছেন।[২২]

যাকাতুল ফিত্বর আদায় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ : যাকাতুল ফিত্বর নিজে আদায় করাই উত্তম। তবে কারণবশত তা আদায় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ।[২৩]

আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার ও সঠিকভাবে ছাদাক্বতুল ফিত্বর আদায় এবং বণ্টন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

[১৫] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫; মিশকাত, হা/১৮১৬।

[১৬] ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাদাক্বাতুল ফিত্বর’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/১৮১৫।

[১৭] আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭

[১৮] ফাতহুল বারী (বৈরুত : দারুল মা‘রেফা), ৩/৩৭৬।

[১৯] ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১, ‘যাকাত’ অধ্যায়, ‘ছাদাক্বাতুল ফিত্বর’ অনুচ্ছেদ।

[২০] ছহীহ ইবনু খাযায়মা, হা/২৩৯৭, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪৬।

[২১] ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১; ফাতহুল বারী, ৩/৩৭৬।

[২২] আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, হাদীছ ছহীহ।

[২৩] মাজমূ‘উল ফাতাওয়া লি ইবন উছায়মীন, ১৮/৩১০।

ঈদের মাসায়েল

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা :

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু’দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৫]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয় :

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৬] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুবতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবলমাত্র খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম :

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

---

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।

৩. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।

৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।

৫. আবূ দাউদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।

৯. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।

১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।

১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।

১২. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩] উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল :

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমাণিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে সালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবলমাত্র মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীয়ত সম্মত নয়।[২১] ঈদের সালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছ সম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ‘তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা’। অর্থাৎ ‘আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!’[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর হাতে দান করলেন।[২৭]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা :

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ‘ঈদুল

---

[১৩] আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
[১৪] তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।
[১৫] ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
[১৬] যাদুল মা'আদ।
[১৭] ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
[১৮] আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
[১৯] ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
[২০] ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
[২১] ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।
[২২] ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
[২৩] ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
[২৪] ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
[২৫] ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
[২৬] তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
[২৭] ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।

ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর’।[২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[২৯] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ’।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা-এর গোলাম নাফে‘ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ‘আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন’।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে ‘ছহীহ’ বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ ‘ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ একে ‘ছহীহ’ বলেছেন।[৩৫]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :

ঈদের ছালাত দু’রাকআত।[৩৬] নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু’তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু’হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ক্বমার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।
২৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।
৩০. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
৩১. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
৩২. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
৩৩. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
৩৪. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
৩৫. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
৩৬. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
৩৭. ইবনু খুযায়মা।
৩৮. যাদুল মা‘আদ, ১/৪৪১।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
৪০. যাদুল মা‘আদ, ১/৪২৯।

শাফাআতের প্রকারভেদ, কারা শাফাআত করবেন এবং তা লাভের মাধ্যমগুলো কী?

*[১৩ শা‘বান, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ২৬ মার্চ, ২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ মাহির বিন হামাদ আল-মুআয়ক্বীলী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত মুহাদ্দিছ ও ‘আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ’-এর গবেষণা সহকারী **শায়খ আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**। খুৎবাটি ‘**মাসিক আল-ইতিছাম**’-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং গুণাবলিতে একক সত্তা। আমি তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল কিছুকে তাঁর রহমত এবং জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছেন। তিনি অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা আমাদের পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী, আমাদের নেতা। তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আল্লাহ তাকে সত্য এবং হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাকে বড় শাফাআতকারী হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ তার ও তার পরিবার, সঙ্গী এবং পরবর্তী সকল অনুসারীদের প্রতি শান্তি, দয়া এবং বরকত নাযিল করুন- আমীন!

অতঃপর হে মুমিনগণ! আমি নিজেকে এবং আপনাদের তাক্বওয়া অবলম্বন করার অছিয়ত করছি। কেননা তাক্বওয়াই হচ্ছে পরকালের সম্বল এবং বিচার দিবসের আসল প্রস্তুতি। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তার পরকালীন জীবনের হিসাব করে। আর দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তির জন্য লাঞ্ছনা এবং লজ্জা যার ঠিকানা জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতালের মতো; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত, আল্লাহর আযাব সুকঠিন *(আল-হজ্জ, ২২/১-২)*।

হে মুসলিম উম্মাহ! আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তাঁর সৃষ্টির উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর বান্দার উপকারের সবচেয়ে বড় অধ্যায় হচ্ছে সুপারিশের অধ্যায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে লোক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার পাপের একটি অংশ পাবে। বস্তুত, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল’ *(আন-নিসা, ৪/৮৫)*। সৎকাজে সুপারিশ; সুপারিশকৃত ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য অথবা তাকে ক্ষতি হতে বাঁচানোর জন্যও হতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভালো কাজে সুপারিশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং তার ছাহাবীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। আবূ মূসা (আশআরী) রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন, ‘তোমরা সুপারিশ করো ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা তাঁর নবীর মুখে চূড়ান্ত করেন’।[১]

হে মুসলিম সমাজ! এটি দুনিয়াবী ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশের একটি অংশ। আর পরকালীন জীবনে প্রত্যেক মানুষ তার সুপারিশের মুখোপেক্ষী হবে। যেদিন শিশুরা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাবে, আর বৃদ্ধরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। মানুষ সেদিন একাকী সঙ্গীহীন অবস্থান করবে। সেদিন কোনো সম্পদ এবং প্রভাব থাকবে না। যেদিন কোনো সঙ্গী সন্তান-সন্ততি সাথে থাকবে না। ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে’ *(আত-তূর, ৫২/২১)*। প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করে তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে স্ব-স্ব পাপসমূহ স্বীকার করবে এবং তার বিচার ফয়সালা কী হবে? এর জন্য অপেক্ষা করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে’ *(আবাসা, ৮০/৩৪-৩৭)*। আল্লাহ তাআলা শাফাআত (সুপারিশ)কে সুপারিশকৃত ব্যক্তির জন্য রহমত সুপারিশকারীর জন্য তা মর্যাদার বিষয়

---

[১] ছহীহ বুখারী, হা/১৪৩২।

বানিয়েছেন। সেদিন ফেরেশতাগণ, নবীগণ, শহীদগণ নেককার বান্দাগণ আল্লাহর নিকট জাহান্নামীদরে জন্য শাফাআত করবেন। এমনকি ছিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফাআত করবে। ছিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার শাফাআত কবুল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।[২] শাফাআতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোনো নবী বা কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতার নিকট শাফাআত চাওয়া যাবে না, বরং তা একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘বলুন, শাফাআতের বিষয়টি পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য’ *(আয-যুমার, ৩৯/৪৪)*। তবে যাকে আল্লাহ শাফাআত করার অনুমতি দিবেন কেবল সেই শাফাআত করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ও যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন’ *(আন-নাজম, ৫৩/২৬)*। প্রত্যক নবী দুনিয়াতে আল্লাহর নিকট যা চেয়েছেন আল্লাহ তার দু‘আ কবুল করেছেন। তবে আমাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে দু‘আ করেছিলেন যেন কিয়ামতের দিন তার উম্মতের জন্য শাফাআত করার অধিকার তাকে দেওয়া হয়। যেদিন আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা হতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে এক ময়দানে একত্রিত করবেন। সূর্য অতি নিকটে থাকবে। তারা জুতাবিহীন নগ্ন হয়ে খাতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে। সেখানে তারা প্রচণ্ড কষ্টে ৫০ হাজার বছর অবস্থান করবে। তখন অতিষ্ঠ হয়ে সকল মানুষ বিচারকার্য শুরু করার জন্য, তাদেরকে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করার জন্য নবীদের নিকট ছুটাছুটি করবে। কোনো নবী শাফাআত করবে না। তখন সবাই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসবে, তাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি সুপারিশ করবেন, আল্লাহ তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহ বলবেন, ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতের মধ্য হতে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও’। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার প্রভু আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যাদের কোনো হিসাবও নেওয়া হবে না এবং শাস্তিও প্রদান করা হবে না। আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরো ৭০ হাজার। আর আমার প্রতিপালকের দুই হাতের মুষ্ঠির তিন মুষ্ঠি পরিমাণ’।[৩] প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ; তিনি অশেষ দয়ালু, অনুগ্রহকারী।

হে মুসলিম উম্মাহ! আমাদের নবী কয়েকটি স্থানে সুপারিশ করবেন— (১) জান্নাতের ফটক বন্ধ থাকবে। কোনো নবী সুপারিশ করবেন না, আল্লাহর নবীর সুপারিশে সেই জান্নাতের ফটক খোলা হবে। কিয়ামত দিবসে আমি জান্নাতের তোরণে এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইব। তখন দ্বাররক্ষী বলবেন, আপনি কে? আমি উত্তর করব, মুহাম্মাদ। দ্বাররক্ষী বলবেন, আপনার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আপনার পূর্বে অন্য কারোর জন্য দরজা খুলিনি।[৪] (২) তিনি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা কাবীরা গুনাহের জন্য জাহান্নামে যাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমার উম্মতের কাবীরা গুনাহগারদের জন্য আমি সুপারিশ করব’।[৫]

হে তাওহীদে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে মুমিন বান্দাগণ তাদের নিজ ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। তাদের অনেকেই বড় একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে। আবার অনেকেই গোত্রের জন্য আবার অনেকেই কোনো কিছু মানুষের জন্য আবার অনেকেই একজন ব্যক্তির জন্য। ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! বন্ধু যদি নেককার হয় তাহলে সে উপকারী হবে। আর আত্মীয় যদি নেককার হয় তাহলে শাফাআত করবে।

হে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব! কিয়ামত দিবসে যখন সকলের সুপারিশ করা শেষ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে আরো কিছু ঈমানদার পাপী মানুষ অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের জান্নাতে দিবেন। আল্লাহ বলবেন, এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করল, নবীগণও সুপারিশ করল এবং মুমিনরাও সুপারিশ করল, কেবল আরহামুর রাহিমীন- পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে, যারা কখনো কোনো সৎকর্ম করেনি এবং

---

[২] মুসনাদে আহমদ, হা/৬৬২৬।

[৩] তিরমিযী, হা/২৪৩৭।

[৪] ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭।

[৫] মিশকাত, হা/৫৫৯৮।

আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশমুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেওয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানিতে সতেজ হয়ে ওঠে। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি কোনো বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি, যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে, সেগুলো সাদা হয়ে যায়? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হলো 'উতাকাউল্লাহ' (আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত)। কোন সৎ আমল ছাড়াই আল্লাহ তাআলা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৬] হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্রও পিতার কোনো উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদের প্রতারিত না করে *(লুক্বমান, ৩১/৩৩)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

হামদ ও ছালাতের পর... অতঃপর হে মুমিনগণ! যারা সুপারিশ লাভে ধন্য হবেন, তারা হলেন-

(১) তাওহীদে বিশ্বাসী : নিশ্চয় কিয়ামতের দিন একনিষ্ঠ তাওহীদে বিশ্বাসীগণ ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, তোমরা আহ্বান করো তাদেরকে, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (মা'বূদ) মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার পৃষ্ঠপোষকও নেই। যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ কাজে আসবে না' *(সাবা, ৩৪/২২-২৩)*। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করার অধিকার নেই।

(২) ছালাত আদায়কারী : রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ লাভে ধন্য হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠভাবে বলবে, لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং ছালাত আদায় করবে। সুতরাং, ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি ও শিরক-কুফরের মাঝে পার্থক্য ছালাত'।[৭] সুতরাং, যারা মহান রবের সাথে শিরক করবে অথবা ছালাত আদায় করবে না, তাদের পক্ষে কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়ামতের মাঠে যারা সুপারিশ লাভে ধন্য হবেন তাদের অন্যতম হলেন ঐ ব্যক্তি, যে বেশি বেশি রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে। রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুয়াযযিন যা বলবে, তোমরাও তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ ১০টি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একজন বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই হব সেই বান্দা। সুতরাং, যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, সে (আমার) সুপারিশপ্রাপ্ত হবে'।[৮]

শাফাআত লাভের আরো কিছু মাধ্যম হচ্ছে- বেশি বেশি সৎ আমল করা।[৯] যেমন : বেশি বেশি সিজদা করা, মদীনায় মৃত্যুবরণের সৌভাগ্য লাভ করা।[১০]

হে আল্লাহ! আমাদের আপনি আপনার নবীর সুপারিশ লাভে ধন্য করুন, হাওযে কাওছারের পানি দ্বারা তৃপ্ত করুন, আপনার রহমত দ্বারা আমাদের ভাই-বন্ধুগণ, ছেলে সন্তান, আমাদের আলেমগণসহ সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ, তার পরিবার-পরিজন, তার সকল ছাহাবীগণসহ কিয়ামত পর্যন্ত তার যতো অনুসারী আসবে সকলের উপর শান্তি নাযিল করুন! আল্লাহ! পৃথিবীর যেখানে যেসকল মুসলিমগণ অবহেলিত লাঞ্ছিত, অপমানিত তাদেরকে বিজয় দান করুন! সর্বোপরি আপনি আমাদের ওই সব আমল করার তাওফীক্ব দান করুন, যে সকল আমল দ্বারা আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি- আমীন!

---

[৬] ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩।

[৭] ছহীহ মুসলিম, হা/৮২।

[৮] ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪।

[৯] ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯।

[১০] মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৪৩৭

আল্লাহর ভালোবাসা

*-আবু রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম**

আমরা দুনীয়াবী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। পরকালীন জীবনের ভাবনা আমাদের নেই বললেই চলে। আমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। দুনিয়ার জীবনে মানুষের সামান্য ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা কি না করে থাকি! মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির আশায় কত মিথ্যা পন্থাই না আমরা অবলম্বন করি! অথচ আল্লাহর ভালোবাসার সুধা পান করার সৌভাগ্য যাদের হবে, তাদের কীভাবে আপ্যায়ন করানো হবে তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلً.

‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস প্রস্তুত করা আছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চাইবে না’ *(আল-কাহফ, ১৮/১০৭-১০৮)*।

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। তাদের ভালোবেসে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। তা হলো জান্নাতুল ফিরদাউস। জান্নাতের যে স্তর রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম জান্নাত এটি, যা আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.

মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আমার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত’।[১]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, যে কাজ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, সেই কাজগুলো শুধু তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করলেই তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তার জান্নাতে যেতে কোনো বাধা থাকবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর তিনি আকাশবাসীর মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর সে ব্যক্তির জন্য যমীনেও গ্রহনযোগ্যতা রেখে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা করো। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম ও তাকে ঘৃণা করেন। এরপর আকাশবাসীর মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। তখন আকাশবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর যমীনের বুকেও তাকে ঘৃণা করা হয়’।[২]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে আকাশবাসী ও যমীনবাসী সবাই ভালোবাসেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন, আকাশ ও যমীনবাসী সবাই তাকে ঘৃণা করেন। আকাশ ও যমীনবাসীর মনে তার ঘৃণা রেখে দেওয়া হয়।

---

* ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর.পি.আই।

[১] মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৫০৮; মিশকাত, হা/৫০১১।

[২] ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৭; মিশকাত, হা/৫০০৫।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تبتاعَ مِنْهُ وإِمَّا أَن تجدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثيابَكَ وإِمَّا أَنْ تجدَ مِنْهُ ريحًا خبيثةً.

আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ভালো এবং মন্দ লোকের সাথে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে আতর বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁক দানকারীর মতো। আতর বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু আতর দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনে নিতে পারো, অন্যথা তুমি তার সুঘ্রাণ পাবেই। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে। এটা না হলেও তুমি তার ধোঁয়ার গন্ধ পাবেই'।[৩]

অর্থাৎ ভালো ব্যক্তির নৈতিক আচরণের সুফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আতরের ন্যায় আর মন্দ ব্যক্তির অপকর্মের কুফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে হাঁপরের গন্ধযুক্ত ধোঁয়ার ন্যায়।

عَن أبي سعيد أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়'।[৪]

ঈমানদার ব্যক্তি ব্যতীত কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা মন্দ বা কাফের-মুশরিক ব্যক্তি বন্ধু হলে তার আচার-আচরণের প্রভাব তার মনে পড়বে। সে তাকে তার মতো করে চালাতে চাইবে। একটি প্রবাদ আছে, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। লোহা এমনিতে পানিতে ভাসবে না, ডুবে যাবে, আর যদি কাঠের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভাসবে। তাই ঈমানদার ব্যক্তির সাথে চলাফেরা করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, যারা আমার মহত্ত্বের কারণে পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, যেই দিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই'।[৫]

অর্থাৎ যারা আল্লাহর মহত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করবে, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয়প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত হবেন।

সুধী পাঠক! আসুন, দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত না থেকে পরকাল নিয়ে ভাবি। স্বার্থপর, দুনিয়াসক্ত, অর্থলোভী, ক্ষমতাধর মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আল্লাহর ভালোবাসাকে মানুষের ভালোবাসা লাভের উৎস মনে করি। আল্লাহর ভালোবাসাকে মানুষের ভালোবাসা লাভের উৎস হিসেবে গ্রহণ করলে দুনিয়ার জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়। পরকালীন জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি লাভের আশায় মানুষকে ভালোবাসি। আল্লাহ আমাদেরকে

তাওফীক দান করুন-আমীন!

মাসিক 'আল-ইতিছাম'-এর নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ- ৫০০০ টাকা
৩য় প্রচ্ছদ- ৪০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা- ২০০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা- ১০০০ টাকা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
০১৪০৭-০২১৮৩৯

---

[৩] ছহীহ বুখারী, হা/২১০১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৮; মিশকাত, হা/৫০১০।

[৪] তিরমিযী, হা/২৩৯৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩২; মিশকাত, হা/৫০১৮।

[৫] ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৬; মিশকাত, হা/৫০০৬।

গ্রন্থ পরিচিতি-১০ : ছহীহ মুসলিম

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বরকতময় যবান নিঃসৃত পবিত্র হাদীছসমূহ যারা লিপিবদ্ধ করার ন্যায় দুরূহ কাজ সম্পাদন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ। তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থ ছহীহ মুসলিম উম্মাহর জন্য অমূল্য সম্পদ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো—

নাম ও বিবরণ : গ্রন্থটির নাম হলো, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (আল-মুসনাদুস ছহীহ আল-মুখতাছার বি-নাক্বলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। এটি জামে' গ্রন্থ। তবে এ নামটি ইমাম মুসলিম স্বয়ং এভাবে রেখেছেন তা কিন্তু নয়। বরং ইমাম মুসলিমের বিভিন্ন উক্তির প্রেক্ষিতে এ নামটি রাখা হয়েছে। এতে ৭৪৫৩টি হাদীছ রয়েছে। এ গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে থাকা বাব, অনুচ্ছেদের শিরোনামগুলোও ইমাম মুসলিম সংযোজন করেননি। বরং পরবর্তী ইমামগণ শিরোনাম যোগ করেছেন। তবে ইমাম নববী প্রদত্ত শিরোনামগুলো সর্বাগ্রে রয়েছে। তিনি এগুলো ব্যাখ্যা রচনার সময়ে যুক্ত করেছেন। ফলে গ্রন্থটির সজ্জায়ন বর্ধিত হয়েছে। বুখারীর পরেই এর অবস্থান। অর্থাৎ কুরআনের পর বুখারী, তারপর মুসলিম। তবে ছহীহ মুসলিমের সাজানো-গোছানো বুখারীর তুলনায় অধিকতর চমৎকার। এতে একই হাদীছের একাধিক সনদ রয়েছে। বিখ্যাত এ হাদীছের গ্রন্থটি প্রতিটি মাদরাসার পাঠ্যবই হিসাবে সমাদৃত। বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। এছাড়াও এর একাধিক অনুবাদ বাংলায় বিদ্যমান। 'আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা' হতে মুদ্রিত অনুবাদ গ্রন্থে এর হাদীছ সংখ্যা ৭৪৫৩টি। অন্যদিকে 'ইফাবা' মুদ্রিত ছহীহ মুসলিমে ৭২৮১টি এবং 'ইসলামিক সেন্টার' অনূদিত গ্রন্থে ৭৩৩৭টি হাদীছ রয়েছে। এতে মোট ৫৪টি অধ্যায় বা কিতাব রয়েছে, যা 'কিতাবুল ঈমান' দিয়ে শুরু হয়েছে এবং 'কিতাবুত তাফসীর' দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত শরহে মুসলিম সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য, শায়েখ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী কৃত মুখতাছার মুসলিমে মোট হাদীছ সংখ্যা ৩০৩৩টি।

মানহাজ ও রচনাশৈলী : ইমাম মুসলিম এই গ্রন্থ প্রণয়ে ভিন্নধর্মী মানহাজ ও রচনাশৈলীর প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি প্রথমে একটি 'ভূমিকা' সংযোজন করেছেন, যা ইমাম বুখারীর সাথে কিছুটা ভিন্নতা রাখে। শুধু বুখারী নয়, বরং অন্যান্য সবার সাথেই ভিন্নতা রাখে। কেননা হাদীছ গ্রন্থে এইরূপ ভূমিকা সংযোজন ব্যতিক্রম ঘটনা। এটি অত্যন্ত সংক্ষেপে রচিত হওয়ায় বুঝা দুষ্কর। তাই স্রেফ ছহীহ মুসলিমের ভূমিকার উপরই একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম এই ভূমিকায় ইলমী আলোচনা করেছেন রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে। এখানে তিনি নিজস্ব কোনো উক্তি যুক্ত করেননি। পুরো ভূমিকাই তিনি বর্ণনা তথা রেওয়ায়াত দিয়েই রচনা করেছেন, যা বিস্ময়কর। এটি যদিও একটি ভূমিকা, তবুও একে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে আখ্যা দিলে মোটেও ভুল হবে না।

ছহীহ মুসলিমের শর্তাবলি : ছহীহ মুসলিম সংকলনে ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী নিম্নরূপ।

১. মুত্তাছিলুস সানাদ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনাকারীদের পরম্পরা ধারাবাহিক হতে হবে। ২. বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হতে হবে। কোনো বর্ণনাকারীর মাঝে ন্যায়পরায়ণতার অভাব থাকলে বর্ণনাকারী বর্ণিত হাদীছের বিপরিত আমল করলে তার কোনো হাদীছ গ্রহণ করেননি। ৩. হাদীছ বর্ণনাকারী তার ঊর্ধ্বতন বর্ণননাকারীর সমকালীন হওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাকারী যার থেকে হাদীছ বর্ণনা করছেন উভয়েই সমকালীন হওয়া। ৪. বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর হওয়া। কারণ বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর না হলে তারপক্ষে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণীকে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। ৫. বর্ণিত হাদীছের মতন বা মূল বক্তব্য সবধরনের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হতে হবে।[১]

ব্যাখ্যাগ্রন্থ : ছহীহ মুসলিমের অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন— ১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইসপাহানী (মৃ. ৫২০ হি.) রচিত শরহে ছহীহ মুসলিম। ২. আল-মুফহিম লি-শারহি গরীবি মুসলিম। ৩. আল-মুআল্লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম। ৪. ইকমাল আল-মুআল্লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম। ৫. সিয়ানাতু ছহীহ মুসলিম। ৬. আল-মুফহিম ফী শারহি মুখতাছার মুসলিম। ৭. আল-মিনহাজ ফী শারহি ছহীহ মুসলিম। আরও অগণিত গ্রন্থ হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ছহীহ মুসলিমের ভূমিকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ : ছহীহ মুসলিমের ভূমিকা নিয়েও একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা ইলমে হাদীছের ছাত্রদের জন্য দারুণ উপকারী। যেমন— ১. আল-ঈজায ওয়াল বায়ান লি-শারহি খুত্ববাতি মুসনাদি মুসলিম। ২. শারহু খুত্ববাতি মুসলিম। ৩. শারহু মুক্বাদ্দিমা ছহীহ মুসলিম। ৪. আল-বাহরুল মাওয়াজ। উল্লেখ্য, এ ব্যাখ্যাগুলোরও আবার বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

মুখতাছার গ্রন্থাবলি : মুখতাছার মানে সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ। ছহীহ মুসলিমের অনেকগুলো মুখতাছার গ্রন্থ রয়েছে। যেমন— ১. ইমাম মুনযিরীর মুখতাছার ছহীহ মুসলিম। ২. অসীলাতুল মুসলিম ফী তাহযীবি ছহীহ মুসলিম। ৩. ইখতিছার ছহীহ মুসলিম। ৪. মুখতারুল ইমাম মুসলিম। উল্লেখ্য, এসব মুখতাছার গ্রন্থগুলোরও একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

---

[১] ছহীহ মুসলিমের ভূমিকা 'সারসংক্ষেপ'।

লেখক পরিচিতি : এই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন, مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أَبُو الحسين النيسابوري ‘মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ইবনু মুসলিম আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী নিশাপুরী’।[2] তার নামেই এই হাদীছ গ্রন্থকে ‘ছহীহ মুসলিম’ বলা হয়। তার জন্মসাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতে, তিনি ২০৬ হিজরীতে খলীফা মামূনের যামানায় জন্মগ্রহণ করেন।[3] বাড়িতেই স্বীয় পিতার কাছে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়।[4] তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে হাদীছ শ্রবণ শুরু করেন।[5] হাদীছের সন্ধানে তিনি একাধিক এলাকা সফর করেন।[6] তিনি কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।[7] তিনি ব্যবসা করার সময়েও ক্রেতাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করতেন।[8] তিনি আক্বীদায় আহলেহাদীছ তথা আছহাবুল হাদীছ ছিলেন। তিনি মুজতাহিদ ছিলেন।[9] কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।[10] ছিদ্দীক্ব হাসান খানসহ অনেকেই তাকে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী বলেছেন।[11] যা সঠিক নয়। তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী একে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘তিনি কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তবে শাফেঈ মাযহাবের সাথে তার ফৎওয়া বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াতে অনেকে তাকে শাফেঈ মনে করেন’।[12]

উস্তাদমণ্ডলী : তার অনেক উল্লেখযোগ্য উস্তাদ রয়েছেন। যেমন— আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা ইবনু কানাবী। ইমাম মুসলিম মক্কায় তার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া নিসাপুরী,[13] আহমাদ ইবনু সাঈদ ইবনু ছখর আদ-দারেমী, আব্দুল্লাহ দারেমী, ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ,[14] কুত্বায়বা ইবনু সাঈদ,[15] এছাড়া আরও অনেক উস্তাদের নাম রিজাল গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান।[16]

ছাত্রবৃন্দ : তার বেশুমার ছাত্র রয়েছেন। যেমন— ইমাম তিরমিযী, ইবরাহীম ইবনু আবূ তালেব, আবূ উমার মুসতামলী, ইবনু খুযায়মা, আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হাতেম আর-রাযী প্রমুখ।[17]

গ্রন্থসমূহ : তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। যেমন— ১. ছহীহ মুসলিম। ২. কিতাবুত তামঈয। ৩. কিতাবুল ই‘লাল। ৪. কিতাবুল ওয়াহদান। ৫. কিতাবুল আফরাদ। ৬. কিতাবুল আকরান। ৭. কিতাবু সুওয়ালাতিহী লি আহমাদ ইবনু হাম্বল। ৮. কিতাবু আমর ইবনু শুআইব। ৯ . কিতাবু মাশায়েখে মালেক। ১০. কিতাবু মাশায়েখে ছাওরী। ১১. কিতাবু মাশায়েখে শু‘বাহ। ১২. কিতাবু মা লায়সা লাহু ইল্লাহ রাবিন ওয়াহিদ। ১৩. কিতাবুল মুখাযরামীন। ১৪. কিতাবু আওলাদিছ ছাহাবা। ১৫. কিতাবু আওহামিল মুহাদ্দিছীন ইত্যাদি।

প্রশংসাবাণী : ইমামগণ তার সম্পর্কে যা বলেছেন, তা অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এখানে কয়েকটি প্রশংসাবাণী উল্লেখ করা হলো— ১. মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বলেছেন, ‘পৃথিবীতে চার জন হাদীছের হাফেয রয়েছেন, তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ অন্যতম’।[18] ২. খত্বীব বাগদাদী তাকে ‘অন্যতম ইমাম, হাদীছের হাফেয’ বলেছেন।[19] ৩. আবুল বারাকাত শারাফুদ্দীন বলেছেন, ‘ইমাম মুসলিম এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও আমরা বলি, তিনি একজন ইমাম, হাদীছের হাফেয, হুজ্জাতুল ইসলাম’।[20] ৪. যাহাবী বলেছেন, ‘তিনি বিখ্যাত হাদীছের হাফেয, অত্যন্ত বড় মাপের হাদীছের হাফেয’।[21] ৫. ইবনু হাজার বলেছেন, ‘তিনি ছিক্বাহ, হাদীছের হাফেয, ইমাম, লেখক, ফিক্বহের আলেম’।[22] এছাড়াও আরও অনেক ইমাম তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মৃত্যু : ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ২৬১ হিজরীতে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে এই নশ্বর দুনিয়া হতে বিদায় নেন।[23]

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো, ছহীহ বুখারীর পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছের গ্রন্থ ছহীহ মুসলিম একটি অনবদ্য, কালজয়ী গ্রন্থ হবার সুবাদে সর্বস্তরে ব্যাপক নন্দিত। আল্লাহ লেখককে রহম করুন এবং আমাদের এই গ্রন্থটি ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

[2] হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৫৯২৩।

[3] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ‘য়ান, ৫/১৯৫; ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম, ১/১১; ইমাম মুসলিম : ওয়া মানহাজুহু ফী ছহীহি, পৃ. ১৬।

[4] ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১০/১২০।

[5] তাযকিরাতুল হুফফায, রাবী নং ৫৮৮।

[6] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১২/৫৫৮।

[7] তাহযীবুত তাহযীব, ১০/১১৫; আল-ইবার, ২/২৩।

[8] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১২/৫৭০।

[9] আবূ উবায়দা মাশহূর হাসান, আল-ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, পৃ. ৪৩।

[10] আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃ. ৬৯।

[11] আল-হিত্তাহ, পৃ. ১৯৮।

[12] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/১২২।

[13] সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১২/৫৫৮।

[14] তাহযীবুত তাহযীব।

[15] আল-মুনতাযাম, ৫/৩২।

[16] তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৫৯২৩; তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ২২৬।

[17] তাহযীবুত তাহযীব, রাবী নং ২২৬, ১০/১২৬।

[18] তারীখে বাগদাদ, ২/১৬, সংক্ষেপিত।

[19] তারীখে বাগদাদ, রাবী নং ৭০৪১।

[20] তারীখে ইরবেল ২/১৩৬।

[21] আল-মুঈন ফী তাবাকাতিল মুহাদ্দিছীন, রাবী নং ১১৬৯।

[22] তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৬২৩।

[23] আল-ইরশাদ ফী উলামায়ে হাদীছ, ৩/৮২৫।

কবিতা

অগ্রকর খোঁজে

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

ঐ শোনো, কে বাজায় ডঙ্কা ঈমানের হুংকারে?
দূর হবে শঙ্কা সব বাঁধ ভেঙে যাবে রে।
উড্ডীন পালে তরি পাগল-হিল্লোল মেড়ে যাবে রে,
মুছে তাণ্ডবলীলা যালিমের মসনদ গুঁড়বে রে,
ঘন কালো অন্ধকারে অগ্রকর খোঁজে রে।
ওরে মাঝি ভাই, ভয় নাই ওরে ভয় নাই রে!
বলো জয়! জয় ঈমানের জয়! জয় জয় রে!
'আল্লাহু আকবার' বাণী জপে ক্ষণে ক্ষণে অধরে,
উল্কা-সম গিরি-চূড়া মেড়ে চল তোরা চল রে,
হও আগুয়ান! বিপদ চাহে আসুক বারে বারে,
কূল ছেড়ে যেতে হবে তোকে যে বহুদূর রে!
ওরা থাকুক পিছে, ওদের পানে তাকাস না ফিরে
রবে ওরে তোর লাশের তাণ্ডবলীলায় শুয়ে,
ওরা যালিমের দারোয়ান, বাণী ওদের ফুরফুরে।
তোর রক্ত নদীর অববাহিকায় গাইবে ওরা সুরে সুরে।
আরে কণ্টক! আরে পর্বত! সব মেড়ে তোরা চল রে
ভেসে যাবে সব একদিন তোর রক্ত-জোয়ারে
আর কত অশ্রু ঝরাবি, গোপন বসে কাঁদবি রে ?
এইবার জাগ! জাগ রে! ঐ তরি যায় যায় রে।

নয়া যামানার জিহাদ

-মুহাম্মাদ দিদার বিন আজাহার
শিক্ষার্থী, একাউন্টটিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (AIS) বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আর সময় নাই নষ্ট করার
নাইকো সময় চিন্তা-ভাবনার,
কোথায় তোমার ঢাল-তলোয়ার
কোথায় তোমার তীর?
কোথায় আছো তরুণ-যুবক
খালিদরূপী বীর?
কোথায় আছো উমার ফারূক
আবূ বকর উছমান আলী?
শহীদ হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে
এসো দিতে জীবন বলি!
রক্ত দে তুই, রক্ত দেখা
জয়ধ্বনি তর রক্তে মাখা।
রক্ত ছাড়া হয়নি কভু
বিজয়গাঁথার গান,
রক্ত দিতেই বলি দে আজ
তাগূতগুলোর প্রাণ।
ধর তলোয়ার মাররে চাবুক
দেখুক ধরা সবাই ভাবুক,
ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ করার
দুঃসাহস যে করে,
নিকৃষ্ট এই শাস্তি ধরার
পেতেই হবে তারে।

করোনা নয়; করুণা চাই

-মো. আব্দুল হামীদ
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া,
পবা, রাজশাহী।

করোনা নয়; করুণা চাই
ওগো মোদের মালিক,
তুমি সবার রিযিক্বদাতা
তুমি সবার খালিক।
বিপদ এলে তোমায় ডাকি
ওগো মহীয়ান,
তুমি সবার সৃষ্টিকর্তা
রহীম রহমান।
সবি তোমার দয়া প্রভু
সবি তোমার দান,
তুমি পরম মুক্তিদাতা
তুমি মেহেরবান।
তুমি মালিক তুমি খালিক
তুমি তো সাত্তার,
এই পৃথিবী সৃষ্টি তোমার
তুমি তো জব্বার।
মুসলিমদের রক্ষা করো
ওগো দয়াময়,
তোমার কাছে আমরা সবাই
এই ফরীয়াদ জানাই।

বাংলাদেশ সংবাদ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে দ্বিতীয়

করোনার প্রভাব কাটিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি পুনরায় ভালো করবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। তারা বলছে, ২০২১ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়াতে পারে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। তারপরের ২০২২ অর্থবছরে একটু কমে গড় প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে ভালো করবে মালদ্বীপ। তারপর বাংলাদেশ। তারপরের অর্থবছরেও সবচেয়ে ভালো করবে মালদ্বীপ, তারপর ভারত এবং তৃতীয় স্থানে চলে যাবে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ অর্থবছর (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) শেষে মালদ্বীপের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির দিক থেকে মালদ্বীপের ধারেকাছেও নেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশ। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুন-জুলাই) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। তারপরের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে 'সুখী' বাংলাদেশ

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন নেটওয়ার্কের করা ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে এবার বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে। ১০৮তম স্থান থেকে ২০২১ সালের 'হ্যাপিনেস র‌্যাংকিংয়ে' বাংলাদেশের অবস্থান ১০১তম। গড় আয়ু বিবেচনায় সুখী দেশের তালিকায়ও বাংলাদেশের এবার উন্নতি হয়েছে, ৬৮তম। এই তালিকায় সবার উপরে ফিনল্যান্ড। দেশটি দুটি ক্যাটাগরিতেই শীর্ষে। বাংলাদেশের প্রতিবেশি ভারতের অবস্থান ১৩৯ নম্বরে। পাকিস্তান ১০৫তম, চীন ৮৪তম। ফিনল্যান্ডের পরে তালিকায় থাকা দেশগুলো ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি এবং নরওয়ে। সবচেয়ে অসুখী দেশ আফগানিস্তান (১৪৯), তারপর জিম্বাবুয়ে (১৪৮), রুয়ান্ডা (১৪৭), বসনিয়া (১৪৬)। ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র তালিকার ১৯তম স্থানে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ভারতে কুরআনের আয়াত পরিবর্তনে রিট সুপ্রিম কোর্টে খারিজ

পবিত্র কুরআনের ২৬টি আয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে করা একটি জনস্বার্থ পিটিশন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে *(আল-হামদুলিল্লাহ)*। শুধু তাই নয়, এরকম একটি 'সম্পূর্ণ অর্থহীন' পিটিশন দাখিল করার জন্য আবেদনকারী সৈয়দ ওয়াসিম রিজভীর ৫০,০০০ রুপি জরিমানাও করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ অবশ্য এরপরও পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তারা এই বিষয় নিয়ে কোনো তর্কবিতর্ক শুনতেও আগ্রহী নয়। উল্লেখ্য, ভারতের শীআ ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ ওয়াসিম রিজভী পবিত্র কুরআনের ২৬টি আয়াতের ওপর আপত্তি তুলে পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে দেশটির সুপ্রিম কোর্টে রিট দায়ের করেছিলেন। ওয়াসিম রিজভী তার আবেদনে উল্লেখ করেন, '২৬টি আয়াত বিদ্বেষ, সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদকে উসকে দিচ্ছে এবং কাফেরদের হত্যায় প্রলুব্ধ করছে। তার ভাষায়-আর্জিতে উল্লিখিত ২৬টি আয়াত আল্লাহর কালাম নয়। আবূ বকর, উমার ও উছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুম পরদেশ গ্রাস করার মানসে এ আয়াতগুলো কুরআনে সন্নিবেশিত করেছেন'। এর প্রতিবাদে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কুরআনবিদ্বেষী সৈয়দ ওয়াসিম রিজভীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন ভারতের সর্বস্তরের সুন্নী মুসলিমরা। তারা রাজপথে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়াকেন্দ্রিক শীআ জনগোষ্ঠীও ওয়াসিম রিজভীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং শান্তি মিছিল বের করেছে। ইমামবাড়ায় ওয়াসিম রিজভীর জন্য নির্ধারিত কবরের জায়গার বরাদ্দ বাতিল করা হয়। সৈয়দ ওয়াসিম রিজভী এর আগে বাবরী মসজিদ নিয়ে মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী মন্তব্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতের ইতিহাসে কুরআন নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়ে রিট করার নজির আছে। জনৈক চাঁদমল চোপড়া ১৯৮৫ সালের ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দাখিল করেন যাতে কুরআন প্রচার, চর্চা ও মুদ্রণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ২৯ মার্চ তিনি ভারতে কুরআন বন্ধের আবেদন জানিয়ে ভারতীয় পেনাল কোডের ১৫৩এ এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের ৯৫ সেকশনের অধীনে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। আদালত শুনানির প্রথম দিনেই মামলা খারিজ করে দেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, 'কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ বন্ধের এখতিয়ার আদালতের নেই'।

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনকে এক লাখ করোনা টিকা উপহার চীনের

অধিকৃত এলাকার ফিলিস্তীনিদের করোনার টিকা দিতে ইসরাইল অস্বীকৃতি জানালেও ফিলিস্তীনিদের জন্য নিজেদের তৈরি এক লাখ টিকা পাঠিয়েছে চীন। চীনের সিনোফার্মের তৈরি এ টিকার চালান এরই মধ্যে ফিলিস্তীনে গিয়ে পৌঁছেছে। ৭০ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া ফিলিস্তীনে এ পর্যন্ত ২ লাখ ৬১ হাজার ৯০১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মারা গেছে ২ হাজার ৭৮৭ জন। ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিমতীরের রামাল্লাহ শহরের কারফিউ ও কঠোর লকডাউন সত্ত্বেও ভয়াবহভাবে বিস্তার ঘটেছে করোনাভাইরাসের। এখানকার হাসপাতালগুলোতে তিল ঠাঁই নেই রোগীদের জন্য। ইসরাইল নিজেদের নাগরিকদের প্রায় সবাইকেই টিকার আওতায় আনলেও ফিলিস্তীনিদের দখলকৃত এলাকায় টিকা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। উল্লেখ্য, অধিকৃত পশ্চিমতীর ও গাজা উপত্যকায় ৫২ লাখ ফিলিস্তীনির বসবাস।

পাঁচ ওয়াক্ত আযানের ধ্বনিতে ফোটে যে ফুল

সুবহানাল্লাহ, মুআযযিনের সুরেলা কণ্ঠে যখন আযানের বাণীগুলো উচ্চারিত হয় তখন এর সঙ্গে ছন্দ মিলে ফুটে এক ফুল। আযানের ধ্বনিগুলো যেন ফুলগুলোকে ইবাদতের জন্য জাগ্রত করে তুলে। প্রতিটি সুমধুর ধ্বনিতে পাপড়িগুলো ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা। প্রত্যেক ওয়াক্তের আযানের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে এই উদ্ভূত ফুল। আর সে কারণেই ফুলটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘আযান ফুল’। আজারবাইজানের এক মুসলিম গ্রামে মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের বাগানে এ ফুলের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা আযানের ধ্বনিতে ফোটে। এই ফুল প্রতি পাঁচ ওয়াক্তে আযানের ধ্বনিতে ফোটে। আযানের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে এই ফুলকে অনেকেই ইভিনিং প্রাইমরোজ বা সানকাপস বা সানড্রপস নামে চেনেন। ১৪৫ প্রজাতির মধ্যে এটি একটি হলদে রঙের ফুল। ধারণা করা হয় এ ফুলের উৎস আমেরিকাতে। অন্য গানের সুর বা কখনো আযানের মতো করে অন্য কোনো সুর দিয়েও গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কিন্তু এ ফুল ফোটেনি। এখন পর্যন্ত এর কোনো ব্যাখ্যা নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন কিন্তু কখনো এ বিষয়ে কোনো কার্যকরী সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। তারা এই ফুলের সামনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক বাজিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এই ফুল শুধু আযানের সময়ে আযান শুনেই ফোটে এবং আযান শেষে বন্ধ হয়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

ড্রোনের মাধ্যমে নামানো হবে বৃষ্টি

মরুভূমির দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। সবচেয়ে কম বৃষ্টি হওয়া অঞ্চলগুলোর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য তালিকার উপরের দিকেই রয়েছে। তবে এ সমস্যার সমাধানে বিশেষ ড্রোনকে ব্যবহার করবে প্রযুক্তিবিদরা। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিশেষভাবে তৈরি বেশ কিছু ড্রোন উড়ে যাবে মেঘগুচ্ছের কাছে। এরপর সেখানে ড্রোন থেকে বৈদ্যুতিক শক বা তাপ দেওয়া হবে। যাতে মেঘ গলে যায় আর তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে ক্লাউড সিডিং প্রযুক্তিরও ব্যবহার করেছে তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বছরে সাধারণত ১০০ মিলিমিটার পরিমাণ বৃষ্টি হয়। সার্বিক বিচারে দেশটিতে প্রয়োজনের তুলনায় এটি খুবই কম। তাই তারা ২০১৭ সালে ১৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে পৃথক কয়েকটি বৃষ্টিবর্ধন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছিল। এর মধ্যে একটি প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিডিং ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে মেঘের ফোঁটাগুলোতে বৈদ্যুতিক তাপের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা।

পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওষুধ

ওষুধটির নাম জোলগেনসমা। যার এক ডোজের দাম শুনলে চোখ গাছে উঠতে পারে। এই ওষুধের এক ডোজের দাম ১৮ কোটি টাকা। স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাটরোফি (SMA) নামের এক বিরল রোগের ওষুধ এটি। এ রোগটি কোটিতে একজনের শরীরে দেখা যায়। যার হয়, তার তো জীবন বরবাদই, সঙ্গে ডুবে যায় পরিবারও। বিরলতম জেনেটিক এই রোগ মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়ার পাশাপাশি শরীরের পেশিগুলোকে দুর্বল করে দেয়। কোনো এক সময় হাঁটাচলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন এসএমএ আক্রান্ত ব্যক্তি। অনেক সময়ে তা মানুষের মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। বিরলতম এসএমএ-র চিকিৎসায় নোভার্টিস জেনে থেরাপিয়েস বাজারে নিয়ে এল জোলগেনসমা। যে ওষুধের এক ডোজের দামই ১৮ কোটি টাকা। প্রধানত শিশুরা এসএমএ-র প্রথম টাইপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে, যা পরে তাদের প্রাণহানির কারণ হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে জোলগেনসমার প্রয়োগে সেই সব শিশুরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা→ ভ্রান্ত দল ও মতবাদ

প্রশ্ন (১) : জনৈক শায়েখের আলোচনায় জানতে পারলাম ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর হত্যার সাথে ইয়াযীদের কোনো হাত ছিল না। কথাটি কতটুকু সত্য?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : খলীফা ইয়াযীদের শাসনামলে ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম ইরাকের কারবালা নামক স্থানে হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে হত্যা করা হয়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, নিশ্চয় ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে হত্যার নির্দেশ দেননি। তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে কেবল ইরাক দখল করা হতে বাধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন' (মাজমূঊ ফাতাওয়া, ৩/৪১১)। তিনি আরো বলেন, 'হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর স্ত্রী-পুত্রগণ যখন ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের অনেক সম্মান করেছেন এবং নিরাপত্তার সাথে তাদেরকে পুনরায় মদীনায় পৌঁছে দিয়েছেন' (প্রাগুক্ত)। ইতিহাসগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে প্রকৃত দোষী দুই জন। ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও সীমার। কারণ কূফাবাসীর বায়আত গ্রহণের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যখন তিনি তথায় আগমন করেন এবং তার সাথে বেঈমানী করত তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ কূফার গভর্নর ছিল এবং সে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। আর সীমার সরাসরি হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২১৪)। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়, হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর হত্যার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলেন না, এ কথা সত্য। তাই ইয়াযীদকে গালাগালি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (২) : 'খাতামুন নাবীয়্যিন' বলা হয়েছে, কিন্তু 'খাতামুর রাসূল' বলা হয়নি কেন? তাহলে কি রাসূলের আগমন আজও চলমান?

-আব্দুস সাকী আহমাদ
দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : না, রাসূলের আগমন চলমান নেই। বরং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবুঅত ও রিসালাত উভয়ের সমাপ্তি ঘটেছে। কেননা তিনিই ছিলেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। কেননা নবী হওয়া ছাড়া রাসূল হওয়া যায় না। এই জন্য প্রত্যেক রাসূলই নবী ছিলেন। কিন্তু সব নবী রাসূল ছিলেন না। যেহেতু কোনো নবী আসবেন না, সেহেতু স্বভাবতই কোনো রাসূলও আর আসবেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী' (আল-আহযাব, ৩৩/৪০)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পরে ৩০ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'আল্লাহর নবী' বলে দাবী করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পরে কোনো নবী নেই' (আবূ দাঊদ, হা/৪২৫২; মিশকাত, হা/৫৪০৬)।

প্রশ্ন (৩) : জনৈক হিন্দু তার মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে ও পূর্বের কৃতকর্মের জন্য তওবা করে। তার তওবা কি কবুল হবে?

-আলিফ আহমাদ

উত্তর : হ্যাঁ, তার তওবা কবুল হবে। কেননা কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে আপনার হাত প্রসারিত করে দিন, আমি আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণের বায়আত করব। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার কী হলো, হে আমর? আমি বললাম, আমার কিছু শর্ত আছে। তিনি বললেন, কী শর্ত? আমি বললাম, আমি চাই আমার (পূর্বের কৃত) গুনাহ যেন মাফ করে দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, 'আমর! তুমি কি জানো না 'ইসলাম গ্রহণ' পূর্বেকার সকল গুনাহ বিনাশ করে দেয়। হিজরত সে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়, যা হিজরতের পূর্বে করা হয়েছে। এমনিভাবে হজ্জও তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়? (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১; মিশকাত, হা/২৮)।

প্রশ্ন (৪) : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পৃষ্ঠদেশে যে মোহরে নবুঅত ছিল, সেটা কি কোনো চিহ্ন?

-আবু রায়হান
ভেলাজান, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মোহরে নবুঅত হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নবী হওয়ার সত্যতার প্রমাণ। এর আকৃতি ছহীহ মুসলিমে এসেছে, জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কাঁধের পাশে মোহর নবুঅত দেখেছি কবুতরের ডিমের সমান, যা শরীরের

মতোই (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪৪)। অপর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর সাথে রুটি ও গোশত অথবা ছারীদ খেতে খেতে তাকে দেখেছি। ...এক পর্যায়ে আমি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে মোহরে নবুঅতের দিকে তাকালাম। দেখলাম তা রয়েছে দুই কাঁধের মাঝে, বাম কাঁধের একটু উপর দিকে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙ্গুলের ফুলে উঠা গোড়াগুলোর মতো উঁচু। তার চতুর্পার্শ্বে ছিল ছোট ছোট তিল (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪৬)। তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ছিল (শামায়েলে তিরমিযী, হা/২০)। ফলকথা, মোহরে নবুঅত ছিল কবুতরের ডিমের আকৃতির গোশতের পিণ্ড, যা দেখতে শরীরের মতোই ছিল। তার চতুর্পার্শ্বে ছোট ছোট তিল ছিল, সেগুলোতে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ছিল। ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

কুরআন→ ফযীলত

প্রশ্ন (৫) : কুরআন খতমের নিয়্যতে নিয়মিত ১/২ পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করি। পাশাপাশি ফযীলতের সূরাগুলোও দিনে-রাতে বেশি বেশি তেলাওয়াত করি। এ ভাবে তেলাওয়াত করা কি বিদআত হবে?

-কুদরত-ই-এলাহী
লালপুর, নটোর।

উত্তর : এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করলে বিদআত হবে না। বরং ফযীলতপূর্ণ আয়াতগুলো মাঝে মাঝে পাঠ করার জন্য নির্দেশনা আছে। যেগুলো নির্ধারিত সময়ে পড়াই উত্তম। যেমন, (ক) সূরা মুলক রাতে পড়লে কবরের আযাব মাফ হয় (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৫৮৯, সনদ ছহীহ)। (খ) সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত রাতে পড়লে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারে না (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১, ৫০০৯)। (গ) ফরয ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পড়লে তার ফলাফল জান্নাত (নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৭২)। (ঘ) বিপদাপদের সময় নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ইত্যাদি পড়া যায় (আবূ দাঊদ, হা/৫০৮২; নাসাঈ, হা/৫৪২৮; তিরমিযী, হা/৩৫৭৫; মিশকাত, হা/২১৬৩)। তবে স্বাভাবিকভাবে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য এক মাস, দশ দিন, বা সাত দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআন মুখস্থ করেছি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তেলাওয়াত করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমার আশঙ্কা যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে এবং বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তুমি এক মাস অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেন, তাহলে তুমি দশ দিন অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আপনি আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেন, তাহলে তুমি সাত দিন অন্তর খতম করো। আমি বললাম, আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দিন। তখন তিনি তা অস্বীকার করেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১-১১৫২; তিরমিযী, হা/২৯৪৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৩৪৬)।

প্রশ্ন (৬) : কুরআন মাজীদ পুরাতন ও পড়ার অনুপোযোগী হলে করণীয় কী?

-নাজনীন পারভীন
জয়পুরহাট।

উত্তর : কুরআন মাজীদ পুরাতন ও পড়ার অনুপযোগী হলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কুরআন ও হাদীছ অতীব পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। এগুলোর ছিন্ন পাতা বা কিতাব কোনোভাবে যাতে অসম্মানিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই সম্ভবত ছাহাবায়ে কেরাম এগুলো পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মূল কুরায়শী ভাষা আরবীতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। পরে অন্য উপভাষাতেও কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাতে শব্দ ও মর্মগত বিপত্তি দেখা দিলে ৩য় খলীফা উছমান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু কুরআনের মূল কুরায়শী কপি রেখে বাকী সব কপি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে কেবল সেই কুরআনই সর্বত্র পঠিত হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭-৪৯৮৮; মিশকাত হা/২২২১)।

পবিত্রতা→ ওযূ-গোসল

প্রশ্ন (৭) : ওযূ করার পর যদি দৃষ্টিগোচর হয় যে, শরীরের কোনো স্থানে নাপাকী লেগে আছে তাহলে কি পুনরায় ওযূ করতে হবে?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ওযূ করার পর কোনো অঙ্গে নাপাকী লেগে থাকলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। বরং তা ধুয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট হবে। আসমা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম –এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি বললেন, সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভালো করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করবে। আবুস সামহ হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মেয়ে শিশুদের প্রস্রাব ধুতে হয়। আর ছেলে শিশুদের প্রস্রাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬; নাসাঈ, হা/৩০৪; মিশকাত, হা/৫০২, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৮) : ঋতুবতী অবস্থায় কোনো মহিলা মারা গেলে তাকে কয়টি গোসল দিতে হবে?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ঋতুবতী মহিলা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় মারা গেলে তাকে সাধারণ মৃতের গোসলের ন্যায় একটি গোসল দিতে হবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় শাহাদাতবরণকারী শহীদের গোসল দিতে হবে না (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩৩৩)।

প্রশ্ন (৯) : ওযূর পরে উটের গোশত খেলে পুনরায় ওযূ করতে হয়। এর মৌলিক কোনো কারণ আছে কি?

-শাকিল হোসাইন
চরগগনপুর, জামালপুর সদর।

উত্তর : জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযূ করবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৬০; মিশকাত, হা/৩০৫)। কিন্তু উটের গোশত খেলে কেন ওযূ করতে হয় এই ব্যাপারে মতের ভিন্নতা রয়েছে। ইমাম আলাউদ্দীন মারদাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এর কোনো কারণ নেই। বরং বিষয়টি তাআব্বুদী তথা ইবাদতধর্মী ব্যাপার। ওযূর আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাই করতে হবে (আল-ইনছাফ, ১/৩৫৫)। অপরদিকে কেউ কেউ বিষয়টিকে তাআল্লুলী বা কারণভিত্তিক বলে মত দিয়েছেন। তাদের মতে ওযূর আদেশ দেওয়ার কারণ হলো, উটের মধ্যে শয়তানী প্রবৃত্তি আছে (আবূ দাঊদ, হা/১৮৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৬৯)। তাই ওযূর মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তি ও শয়তানী শক্তিকে বিনাশ করে দিতে হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এমনই মত ব্যক্ত করেছেন (শারহু উমদাতিল ফিক্বহ, ১/১৮৫; মাজমূআতুল ফাতাওয়া, ২০/৫২৩)। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উটের গোশত শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে এবং রক্ত গরম করে দেয়। আর ওযূ তা ঠান্ডা করতে সাহায্য করে (এ‘লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৪০)। কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন যে, এখানে ওযূ দ্বারা হাত-মুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য, শারঈ ওযূ নয়। সর্বোপরি, ওযূ করা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ। তাই কোনো হিকমত না জানা গেলেও তার প্রতি আমল করা জরুরী (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)।

ইবাদত→ ছালাত

প্রশ্ন (১০) : ইমাম সাহেব তাবীয বিক্রি করে ও নবীকে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করেন তার পিছনে কি ছালাত আদায় করা যাবে?

ইকরামুল হক, মুর্শিদাবাদ, ভারত;
ও গোলাম নূর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা তাবীয ব্যবহার করা শিরক। আর তা বিক্রয় করাও শিরকের কাছে সহযোগিতা করার শামিল। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তাবীয-ক্ববয লটকালো সে শিরক করল (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪৫৮)। তাছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে হাযির-নাযির বলে বিশ্বাস করা আক্বীদাগত মারাত্মক ভুল। হাযির-নাযির অর্থ তিনি সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারে এবং সবকিছু দেখতে পারে। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে’ (আয-যুমার, ৩৯/৩০)। যদি তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা হতে পারতেন, তাহলে মুমিনদের পক্ষ থেকে যে দরূদ পাঠ করা হয়, তা পৌঁছানোর দায়িত্বে ফেরেশতাদের পালন করতে হতো না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের দরূদ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছানো হয় (নাসাঈ, হা/১২৮২; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮৫৩; দারেমী, হা/২৮১৬; মিশকাত, হা/৯২৪)।

প্রশ্ন (১১) : তারাবীহর ছালাত সর্বনিম্ন দুই রাকআত পড়া যাবে কি?

মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : তারাবীহর ছালাত সর্বনিম্ন দুই রাকআত পড়া যাবে না। বরং তারাবীহর ছালাত আট রাকআতই পড়তে হবে, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু একদা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর রামাযানের রাতের ছালাত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে ১১ রাকআতের বেশি ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাকআত পড়তেন। তুমি (আবূ সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাকআত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) পড়তেন (ছহীহ বুখারী, হা/২০১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৮; ফাতহুল বারী, ৪/৩১৮)। তবে কেউ যদি রাতে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে তাহলে তাকে রাতে ইবাদতকারী হিসাবে গণ্য করা হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি কোনো ব্যক্তি তার পরিবারকে রাতে জাগায় এবং দুজন একসাথে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে অথবা একাই দুই

রাকআত ছালাত আদায় করে তাহলে তাদের জন্য রাতে ইবাদতকারীদের মতো ছওয়াব দেওয়া হয়' (আবূ দাঊদ, হা/১৩০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৩৩৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৬২৬; মিশকাত, হা/১২৩৮)।

প্রশ্ন (১২) : পিছনের কাতারে কোনো মুছল্লী ছালাত আদায় করলে তার সামনের কাতার দিয়ে চলে যাওয়া যাবে কি?

-আব্দুস সামাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : জরুরী প্রয়োজনে ছালাতরত মুছল্লীর সামনে সিজদা পরিমাণ জায়গার বাইরে দিয়ে যেতে পারে। যেমন পেশাব-পায়খানার চাপ সৃষ্টি হলে, সাপ-বিচ্ছুর ভয় থাকলে ইত্যাদি। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কেউ কিছুর আড়াল দিয়ে ছালাত শুরু করে, আর কেউ তার ভেতর দিয়ে চলাচল করতে চায় তাকে বাধা দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কারণ চলাচলকারী (মানুষের আকৃতিতে) শয়তান (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৫; আবূ দাঊদ, হা/৭০০; মিশকাত, হা/৭৭৭)। তবে স্বাভাবিক কোনো অবস্থায় যাওয়া উচিত নয়। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, এতে কী পরিমাণ গুনাহ হয়, তাহলে সে তার সামনে দিয়ে যাতায়াত অপেক্ষা ৪০ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেই উত্তম মনে করত। বর্ণনাকারী আবূ নাযর বলেন, ঊর্ধ্বতন রাবী ৪০ দিন, মাস না-কি বছর বলেছেন তা আমার মনে নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৫১০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৭; মিশকাত, হা/৭৭৬)। উল্লেখ্য যে, জামাআত চলাকালে সকল মুছল্লীর সুতরা হলো ইমাম। তাই ইমামের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ইমামের পিছনে থাকা মুছল্লীদের সামনে দিয়ে যাওয়াতে শারঈ কোনো বাধা নেই। কারণ ইমামের সুতরাই মুছল্লীদের সুতরা হিসাবে গণ্য। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বার আমি একটি মাদি গাধার উপর আরোহণ করে এলাম। তখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিনায় অন্যান্য লোকজনসহ কোনো দেয়ালের আড়াল ছাড়া ছালাত আদায় করছিলেন। আমি কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। এরপর গাধাটাকে চরাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এই কাজে কেউই কোনো আপত্তি জানালো না (ছহীহ বুখারী, হা/৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৪; মিশকাত, হা/৭৮০)।

প্রশ্ন (১৩) : সাহু সিজদা ও তেলাওয়াতে সিজদার মধ্যে পার্থক্য কী? সাহু সিজদা কয়টি দিতে হয়?

-নাজনীন পারভীন
জয়পুরহাট।

উত্তর : ছালাতে ভুলক্রমে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে অথবা পরে দুটি 'সাহু সিজদা' দিতে হয়। রাকআতের গণনায় ভুল হলে বা সন্দেহ হলে বা কম-বেশি হয়ে গেলে বা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হলে 'সাহু সিজদা' আবশ্যক হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহরের ছালাত পাঁচ রাকআত আদায় করলে তাকে বলা হলো ছালাতের রাকআত কি বেশি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কী হলো! তারা বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত ছালাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালামের পরে দুটি সিজদা করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭২; মিশকাত হা/১০১৬)। ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ওয়াজিব তরক হলে 'সাহু সিজদা' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হলে 'সাহু সিজদা' সুন্নাত হবে (আস-সায়লুল জারার ১/২৭৪)। পক্ষান্তরে তেলাওয়াতে সিজদা হলো, পবিত্র কুরআনে এমন কতগুলো আয়াত রয়েছে যেগুলো তেলাওয়াত করলে বা শুনলে মুমিন পাঠক ও শ্রোতা সকলকে একটি সিজদা করতে হয়। তবে কেউ যদি এই সিজদা না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে না। কারণ এটি ফরয সিজদা নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সূরা নাজমের মধ্যে সিজদা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানব সবাই সিজদা করল (ছহীহ বুখারী, হা/১০৭১; বুলূগুল মারাম, হা/৩৪১)। উল্লেখ্য যে, তেলাওয়াতে সিজদার জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। বরং যে কোনো দিকে মুখ করে এই সিজদা দেওয়া যায়। একই আয়াত বারবার পড়লে তেলাওয়াত শেষে একবার সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। স্থান পরিবর্তন হলে আর সিজদা করতে হয় না বা ক্বাযাও আদায় করতে হয় না।

প্রশ্ন (১৪) : জামাআতে ছালাতের ইক্বামত দেওয়ার সময় ইক্বামতের শব্দগুলো দুই দুই বার করে বলে। এমতাবস্থায় উক্ত জামাআত ছেড়ে একাকী ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাজনীন পারভীন
জয়পুরহাট।

উত্তর : ইক্বামত এক বার করে বলাই উত্তম এবং এর প্রতি আমল করাই উচিত। কেননা এর পক্ষেই বেশি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

বরং আবূ মাহযূরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ছাড়া যে সমস্ত ছাহাবী উক্ত মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই একবারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া অনুধাবন করার বিষয় হলো, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিযুক্ত মুআয়াযযিন ছিলেন বেলাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু। আর তিনি তাকে এক বার করে ইক্বামত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫, ৬০৬, ৬০৭; মিশকাত, হা/৬৪১)। তবে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' দুই বার ছিল' (আবূ দাঊদ, হা/৫১০; মিশকাত, হা/৬৪৩)। তাহলে কোন আমলটি গ্রহণ করা উত্তম? উল্লেখ্য, ইক্বামতের শব্দগুলো এক বার করে বলা যাবে না বলে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা জাল (তাযকিরাতুল মাওযূআত, পৃ. ৩৫)। তবে প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় উক্ত জামাআত ছেড়ে অন্যত্র ছালাতের জন্য যাওয়া ঠিক হবে না। বরং উক্ত জামাআতেই ছালাত আদায় করবে। কেননা ইক্বামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়াও বলা যায়। এর পক্ষেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবূ মাহযূরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীছ ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন, তাতে দুই বার করে ইক্বামতের কালেমা উল্লেখ রয়েছে (আবূ দাঊদ, হা/৫০১ ও ৫০২; নাসাঈ, হা/৬৩৩)।

প্রশ্ন (১৫) : ইমামের পিছনে প্রথম কাতার থেকে শুরু করে শেষ কাতার পর্যন্ত ডান দিকে পুরুষ এবং বাম দিকে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে যদিও বাইরে পুরো বারান্দা ফাঁকা রয়েছে। এভাবে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগা।

উত্তর : ইমামকে মধ্যস্থানে রেখে ডান দিকে পুরুষ এবং বাম দিকে মহিলারা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করার পদ্ধতি জায়েয নয়। তবে এক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে ছালাত জায়েয। তা হলো, **(এক)** ইমামের পিছনে পুরুষরা দাঁড়াবে, পুরুষদের কাতার শেষ হলে তাদের পিছনে মহিলারা দাঁড়াবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পুরুষদের জন্য প্রথম লাইন উত্তম এবং শেষের লাইন মন্দ। মহিলাদের জন্য শেষের লাইন উত্তম এবং প্রথম লাইন মন্দ' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪০; মিশকাত, হা/১০৯২)। **(দুই)** ইমামের পিছনে পুরুষরা দাঁড়াবে আর মহিলারা পুরুষদের কোনো এক পাশে (ডানে অথবা বামে) পৃথকভাবে পর্দার অন্তরালে দাঁড়াবে এবং পুরুষ ইমামের অনুসরণ করবে। হাসান বছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইমাম ও তোমার মাঝে নদীর অন্তরাল থাকলেও ছালাত আদায় করতে অসুবিধা নেই'। আবু মিজলায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি ইমামের তাকবীর শোনা যায় তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেয়াল থাকলেও অনুসরণ করা যায়' (ছহীহ বুখারী, 'ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে প্রাচীর বা অন্তরাল' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৬) : জামাআতে ছালাত আদায়ের সময় সামনের কাতার থেকে কাউকে পিছনের কাতারে টেনে নেওয়া যাবে কি?

-আনিছুর রহমান
জয়পুরহাট সদর।

উত্তর : না, সামনের কাতার পূর্ণ হয়ে গেলে সেখান থেকে কাউকে টেনে নিবে না এবং কাতারের মাঝেও ঢুকে যাবে না। বরং একাই পিছনের কাতারে ছালাত আদায় করবে (ইরওয়াউল গালীল, হা/৫৪১; ২/৩২৫ পৃ.)। উল্লেখ্য যে, পূর্ণ কাতার থেকে টেনে নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল (ত্বাবারানী আল-মুজামুল কাবীর, হা/৩৯৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/৫৪১)। আরও উল্লেখ্য যে, 'কাতারে একাকী দাঁড়ালে ছালাত হবে না' মর্মে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হলো, সামনের কাতার ফাঁকা থাকা অবস্থায় কেউ যদি একাকী দাঁড়ায় তাহলে তার ছালাত হবে না (বিস্তারিত আলোচনা দ্র: ইরওয়াউল গালীল, হা/৫৪১; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ. ৪৩২-৪৩৩)।

প্রশ্ন (১৭) : সফরে থাকা অবস্থায় মুক্বীমদের জামাআত পেলে তাদের সাথে ফরয ছালাত পূর্ণ আদায় করব, না-কি ক্বছর আদায় করব?

-নিয়ামুল হাসান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : সফরে থাকা অবস্থায় মুক্বীমের সাথে ছালাত আদায় করলে ফরয ছালাত পূর্ণই আদায় করবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, মুসাফির মুক্বীম ইমামের সাথে দু'রাকআত পেলে তাকে তাদের মতোই পূর্ণাঙ্গ ছালাত আদায় করতে হবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/৫২৯১; ইরওয়াউল গালীল, হা/৫৭১)। তবে একাকী কিংবা অন্যান্য মুসাফিরদের সাথে আদায় করলে ক্বছর করবে। ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বললাম, (ব্যাপার কী) আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে মর্মে যদি ভয় কর, তাহলে তোমরা ক্বছর করতে পার' (আন-নিসা, ৪/১০১)। এখন তো মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা ক্বছর করি কেন?) উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আপনি যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছেন আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এটা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দান। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬; মিশকাত হা/১৩৩৫)।

প্রশ্ন (১৮) : হাফ হাতাবিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করলে কি নেকী বা ফযীলত কম হবে?

-শোয়াইব
ময়মনসিংহ।

উত্তর : উত্তম, মার্জিত ও সুন্দর পোশাক পরিধান করেই ছালাত আদায় করবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করো (আল-আ‘রাফ, ৭/৩১)। রাসূল ﷺ জুমুআর দিনে উত্তম পোশাক পরে মসজিদে আসার কথা বলছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৪৩; ইবনু মাজাহ, হা/১০৯৭; মিশকাত, হা/১৩৮৭, সনদ হাসান)। ছালাতে কাঁধ ঢেকে রাখা জরুরী। তাই হাফ হাতাবিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। এতে নেকী কম-বেশি হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন ছালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোনো অংশ নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫১৬; মিশকাত, হা/৭৬৬)।

ইবাদত→ছিয়াম

প্রশ্ন (১৯) : ছিয়াম অবস্থায় ‘কোভিড-১৯’ ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে কি?

-গোলাম মোস্তফা
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ‘কোভিড-১৯’ ভ্যাকসিন যদি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়; খাদ্যের চাহিদা মেটায় বা পাকস্থলীতে পৌঁছে শরীরে শক্তি যোগায়, তাহলে ছিয়াম অবস্থায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এ জাতীয় ভ্যাকসিন, টিকা বা ইনজেকশন খাদ্য-পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কতিপয় ছাহাবীকে দাওয়াত দিলাম। খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে জনৈক ছাহাবী (নফল) ছিয়ামরত থাকায় খাবারে অংশ গ্রহণ করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ছিয়াম ভঙ্গ করে খাবার গ্রহণ করতে বললেন এবং ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে এটার ক্বাযা আদায় করার জন্য বললেন (বায়হাক্বী, ৪/৪৬২, হা/৮৩৬২, ‘নফল ছিয়াম ক্বাযা করা ঐচ্ছিক’ অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, নায়লুল আওত্বার, ২/২৫৯, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ)। যেহেতু অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারদের স্পষ্ট বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, উক্ত ভ্যাকসিন মানব দেহের মাংস পেশীতে পুশ করা হয়, যা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। সুতরাং ছিয়ামরত অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করা যাবে।

ইবাদত→ হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (২০) : যারা হজ্জ করতে যায় তাদেরকে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ বলে যে, আমার সালামটা রাসূলের কবরে পৌঁছে দিবেন। প্রশ্ন হলো, এভাবে কি রাসূলের কবরে সালাম পৌঁছানো যাবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পরে কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর নিকটে সালাম পৌঁছানোর কোনো বিধান বা প্রমাণ নেই। বরং দুনিয়ার যেখান থেকেই সালাম দেওয়া হোক সেটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফেরেশতা রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, ‘তোমরা আমার কবরকে বার বার আসা-যাওয়ার জায়গা বানিয়ো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো! কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পৌঁছে দেওয়া হয়’ (আবূ দাঊদ, হা/২০৪২)। তিনি আরো বলেন, ‘নিশ্চয় দুনিয়াতে সদা ভ্রাম্যমাণ কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকটে পৌঁছে দেয়’ (নাসাঈ, হা/১২৮২)। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় কবরে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে সালাম দিলে সালামের জবাব দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলমে বারযাখের সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনোভাবেই দুনিয়ার জীবনের সাথে বারযাখী জীবনকে তুলনা করা যাবে না। কারণ তা সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আরও উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি জাল (সিলসিলা যঈফা, হা/২০৩; যঈফুল জামে‘, হা/৫৬৮২)। আর কারো মাধ্যমে সালাম পাঠানোর বিষয়টি মূলত জীবিত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যা (যয়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে, যা কিছু আল্লাহ নিয়ে যান, যা কিছু তিনি দান করেন, সবকিছুই তারই অধিকারে। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং ছওয়াবের অপেক্ষায় থাকে (ছহীহ বুখারী, হা/১২৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৩; নাসাঈ, হা/১৮৬৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৫৮৮)।

ইবাদত→ যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২১) : 'ইয়া নূরু ইয়া বাসিরু' এই বাক্য পড়ে ঘুমালে যা চাইবে তাই পাবে। এ কথার শারঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

-ফারুক ইসলাম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : এ ধরনের যিকিরের কোনো ভিত্তি নেই। বরং তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বরং ঘুমানোর সময় সুন্নাত হলো দু'আ পড়া। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে ঘুমানোর সময় গালের নিচে হাত রাখতেন আর বলতেন, أَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا **উচ্চারণ :** *আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া*। **অর্থ :** হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১৪; মিশকাত, হা/২৩৮২)।

প্রশ্ন (২২) : ছগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার আমলসমূহ কী কী?

-মুনজিলা বিনতে আব্দুল মজীদ
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : ছগীরা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা বেশ কিছু আমল প্রমাণিত হয়। যেমন, **ক.** পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত। **খ.** জুমআর ছালাত (এক জুমআ হতে অপর জুমআর ছালাত এর মাঝের ছগীরা গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরুপ)। **গ.** রামাযানের ছিয়াম (এক রামাযান হতে অপর রামাযানের ছিয়াম পুরো এক বছরের ছগীরা গুনাহের কাফফারাস্বরূপ) (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩)। **ঘ.** ৩৩ বার سُبْحَانَ (আল্লাহ পরম পবিত্র), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং ১০০ বার পূরণের জন্য একবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর)* পাঠ করা। (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯৭; মিশকাত, হা/৯৬৭)। **ঙ.** অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি বেশি পদচারণা করা, এক ছালাত হতে অপর ছালাতের জন্য প্রতিক্ষা করা (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫১; মিশকাত, ২৮২)। **চ.** আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করা (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪)। **ছ.** ফরয হজ্জ পালন করা (ছহীহ বুখারী, হা/১৮১৯; নাসাঈ, হা/২৬২৭)। **জ.** পাপ কাজ ঘটে গেলে সাথে সাথে ভালো আমল করা (হূদ, ১১/১১৪)। উল্লেখ্য যে, কাবীরা-ছগীরা সকল গুনাহ তওবা করলে ক্ষমা হয়ে যায় (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। অতএব আমাদের উচিত পাপ ছোট হোক বা বড় হোক, পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করা।

প্রশ্ন (২৩) : কোন দু'আ পড়লে ও কী কাজ করলে শয়তান আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না ও আমাদের থেকে দূরে পালাবে?

-ফারুক ইসলাম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু'আগুলো পড়া যায়। যেমন,

(١) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম*। (আন-নাহল, ১৬/৯৮; তিরমিযী, হা/২৪৫; মিশকাত, হা/৮৪৪)।

(٢) أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণ : *'আ'ঊযুবিল্লা-হিস সামীই'ল আলীম মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী'* পড়া যায় (আবূ দাঊদ, হা/৭৭৫, সনদ ছহীহ)।

(٣) أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিং কুল্লি শাইত্ব-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাহ, ওয়া মিং কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ* (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১; মিশকাত, হা/১৫৩৫)।

আর শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলোও করা যায়। যেমন, সকাল-সন্ধ্যায় সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ পাঠ করা (আবূ দাঊদ, হা/৫০৮২; নাসাঈ হা/৫৪২৮; তিরমিযী হা/৩৫৭৫; মিশকাত হা/২১৬৩)। রাতে আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১)। সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা (ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৯)।

প্রশ্ন (২৪) : ফজর ছালাতের সুন্নাত শেষে ২১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করলে ঋণমুক্ত ও সম্পদশালী হওয়া যায় এবং বন্ধ্যত্বসহ নানান সমস্যা দূরীভূত হয়। এমন আমল কি শরীআতসম্মত?

-মিযানুর রহমান
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, এমন আমল শরীআতসম্মত নয়। কেননা নির্দিষ্টভাবে ফজর ছালাতের পর ২১ বার করে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইবাদত→ মসজিদ-মুছাল্লা

প্রশ্ন (২৫) : পুরাতন মসজিদ বদলি করার জন্য অন্য স্থানে নতুন করে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের স্থানে বসতবাড়ি স্থাপন বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি? আর পুরাতন মসজিদের কোনো মাটি নতুন মসজিদে দিতে হবে কি?

-হারুনুর রশীদ
হরিনাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।

উত্তর : শারঈ কারণবশত মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা যাবে। উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা । একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হলে সে ঘটনা উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু -কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৭)। একদা ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ -কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হয় এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তার চাইতে প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়, অথবা মসজিদটি জীর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে অন্যত্র নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যয় করতে হবে, যা আগের চাইতে অধিক কল্যাণকর হয়। এক্ষেত্রে ‘মাছলাহাত’-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, ‘প্রয়োজন’-কে নয়, যা অনেক সময় নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে। অতএব বাধ্য না হলেও অধিকতর কল্যাণ বিবেচনায় মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে। যেমন সংকীর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা থেকে মসজিদ সরিয়ে খোলা ও প্রশস্ত এবং রাস্তা সংলগ্ন স্থানে পুনঃস্থাপন করা। সেক্ষেত্রে পুরানো মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে নতুন মসজিদে লাগাবে। কারণ এর মধ্যেই ওয়াকফকারীর জন্য অধিক নেকী রয়েছে। এমতাবস্থায় বিক্রীত জমিতে যেকোনো বৈধ স্থাপনা করা যাবে (ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩৩)।

প্রশ্ন (২৬) : একই ব্যক্তি মসজিদের ইমাম, মুআযিযন ও খাদেমের কাজ করতে পারবে কি?

-আযীযুল ইসলাম
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হলে একাই করতে পারে। তবে কাজের সুবিধার্থে পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল থাকা ভালো। তাতে কাজগুলো সুন্দর ও সুচারু হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুগে তাঁর মসজিদে যেমন একাধিক মুআযিযন ছিল, তেমনি ইমাম ও মুআযিযন পৃথক ছিল। বেলাল রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বেলাল যখন আযান দেয়, তখন তোমরা খাও এবং পান করো, যতক্ষণ আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম আযান না দেয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০২)। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুআযিযন (ওয়াক্তের) আমানাতদার। ‘হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুআযিযনদের ক্ষমা করে দিন’ (আবু দাঊদ, হা/৫১৭; তিরমিযী, হা/২০৭)। বিবরণগুলো প্রমাণ করে যে, মসজিদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল রাখা যেতে পারে।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (২৭) : অনিয়মিত ছালাত আদায়কারীর জানাযা কি একজন আলেম পড়াতে পারে?

-আকবর হুসাইন
যশোর।

উত্তর : যে ব্যক্তি ঈমান রাখে অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে ছালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, এমন ব্যক্তির জানাযা দেওয়া যায়। তবে তার জানাযা কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও পরহেযগার আলেমগণ পড়াবেন না। বরং সাধারণ লোকেরা পড়বেন (বুলূগুল মারাম, হা/৫৪২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ব্যাবসাবাণিজ্য→ ব্যাবসা, সূদী কারবার

প্রশ্ন (২৮) : বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো কি বৈধ?

-হাফিজুর রহমান
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : হুন্ডি ব্যাবসা বলতে বুঝায়, কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ অন্য কোনো ব্যক্তিকে বা হুন্ডি-ব্যাবসায়িকে প্রদান করা (ব্যাংকের মাধ্যমে নয়) যাতে সে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয় আর পরিশ্রমের বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। বর্তমানে ব্যাংক সেবা বাস্তবায়িত হওয়ার পর অনেক দেশ হুন্ডি ব্যাবসাকে অবৈধ অর্থ চালান হিসাবে আইন করেছে। সাধারণত সরকারি ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য প্রবাসীরা স্বল্প খরচে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকে যা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধ। তাই

এমন ব্যাবসা না করাই উচিত। কেননা সরকারের কোনো আইন যদি গুনাহের না হয়, তাহলে তা সাধারণ মানুষের জন্য মানা জরুরী। যেহেতু রাষ্ট্রীয় আইনে হুন্ডি ব্যাবসা নিষিদ্ধ। তাই এ থেকে বিরত থাকাই উচিত। নতুবা তা রাষ্ট্রের সাথে ধোঁকা হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। তাছাড়াও এই হুন্ডির মাধ্যমে বড় বড় চোরাচালান হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

হালাল-হারাম→ খাদ্য-পানীয়, পোশাক

প্রশ্ন (২৯) : আমার ফুপা এবং ফুপু সূদের সাথে জড়িত। পারিবারিক সম্পর্কের কারণে তাদের পক্ষ থেকে আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন এবং খাবার পাঠানো হয়। তাদের দেওয়া খাবার বা জামা-কাপড় পরিধান করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-নাহিদা আফরিন
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : কেউ স্বেচ্ছায় কোনো জিনিস দিলে তা গ্রহণ করা উত্তম (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৬৩-৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৪৫; মিশকাত, হা/১৮৪৫)। তবে জেনে-শুনে উক্ত হারাম উপার্জন থেকে প্রদান করা উপঢৌকন গ্রহণ করলে ও তাদের পাঠানো খাবার ভক্ষণ করলে গুনাহগার হবে এবং ইবাদত কবুল হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। তাছাড়া এতে অন্যায়ের সমর্থন করা হবে, যা করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

হালাল-হারাম→ প্রসাধনী-সৌন্দর্য

প্রশ্ন (৩০) : ছেলেরা বিয়ের সময় কিংবা অন্য কোনো সময় হাতে মেহেদী লাগাতে পারে কি?

-আখতার শেখ
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : না, ছেলেরা বিয়ে বা অন্য যে কোনো সময় হাতে মেহেদী লাগাতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, পুরুষের খুশবু হলো যার রং গোপন থাকবে আর সুগন্ধি প্রকাশ পাবে। আর মহিলাদের খুশবু হলো যার রং প্রকাশ পাবে এবং সুগন্ধি গোপন থাকবে (তিরমিযী, হা/২৭৮৭; নাসাঈ, হা/৫১১৭-১৮; মিশকাত, হা/৪৪৪৩, সনদ ছহীহ)। সুতরাং হাতে মেহেদী লাগানো মেয়েদের সজ্জা, যা পুরুষের জন্য হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মহিলার বেশধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারণকারিণী মহিলার উপর আল্লাহ তাআলা লা‘নত করেছেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫; মিশকাত, হা/৪৪২৯)।

হালাল-হারাম→ চাকরি

প্রশ্ন (৩১) : সরকারি চাকরিজীবীদের জিপিএফ ফান্ড থেকে অর্জিত ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা কি বৈধ?

-মুনজিলা বিনতে আব্দুল মজীদ
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : জিপিএফ এর পূর্ণরূপ হলো জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্ট সম্পূর্ণরূপে সূদ, যা হালাল নয়। এরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন’ (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ৫% এবং ঐচ্ছিকভাবে ২৫% পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা রাখা হয়। এই অর্থকে চক্রবৃদ্ধিহারে কাজে লাগিয়ে অবসর গ্রহণকালে কর্মচারীকে বিশাল অঙ্কের টাকা প্রদান করা হয়, যা স্পষ্ট সূদ। তাই এই সূদ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। উল্লেখ্য যে, অনেকেই বলে থাকেন, এটা যেহেতু বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রেখে দেওয়া হয় এবং হাতে আসার আগ পর্যন্ত কর্মচারী উক্ত টাকার মালিকই হতে পারে না, তাই এই টাকা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সূদ বলে গণ্য হবে না। বরং যখন কর্মচারী উক্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে, তারপরে যদি সূদের কাজে লাগায়, তাহলে তখন তা সূদ বলে গণ্য হবে। এই বক্তব্য কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। কারণ- ১. সরকারিভাবে ৫% প্রভিডেন্ট ফান্ডে রাখা বাধ্যতামূলক। বাকী ২০% ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছায় রাখতে পারে ২. অবসর গ্রহণকালে টাকা ফেরত দেওয়ার সময় কত টাকা মূলধন এবং কত টাকা সূদ, তা বলে দেওয়া হয়। তাই ব্যক্তি চাইলে উক্ত সূদ থেকে বাঁচতে পারে ৩. সর্বোপরি কর্মচারী চাইলে তার একাউন্টকে পুরোপুরি সূদমুক্ত রাখার আবেদনও করতে পারে। বিধায় ইচ্ছা করলে সে সূদের একটি টাকাও ভক্ষণ করতে বাধ্য নয়। তাই কোনো যুক্তিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সূদকে হালাল বলার উপায় নেই।

পারিবারিক বিধান→ সম্পর্ক

প্রশ্ন (৩২) : মেয়ে নেই এমন এক ভদ্র লোক ও তার স্ত্রী আমাদের বিবাহের পূর্বে আমার স্বামীকে যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন, ভালোবাসতেন এবং তাকে জামাই বলে সম্বোধন করে আসছেন। পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে আমাকেও তাদেরকে বাবা-মা বলে সম্বোধন করতে হয়। এভাবে তাদেরকে বাবা-মা বলে

সম্বোধন করা যাবে কি? কেননা আমি জানি নিজ পিতা-মাতা ব্যতীত কাউকে বাবা-মা বলে ডাকা জায়েয নয়। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

-মাজেদা বেগম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : নিজের পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধার খাতিরে মা-বাবা সম্বোধন করা দোষাবহ নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি তো তোমাদের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদের শিখিয়ে দেই...’ (আবূ দাঊদ, হা/৮; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩০১)। তবে কোনোভাবেই নিজ পিতা-মাতাকে অস্বীকার করার মানসিকতা রাখা যাবে না (বুখারী, হা/৩৫০৮; মুসলিম, হা/৬১)। উল্লেখ্য যে, এমতাবস্থায় কাউকে পিতা বলে সম্বোধন করলেও তার সাথে পর্দা বজায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩) : একজন গরীব মহিলা সন্তান নষ্ট করতে চাইলে জনৈক ব্যক্তি সন্তান বাবদ সকল খরচ বহন করে তাকে দত্তক নেয়। এখন সন্তানটির আইডিকার্ড তৈরি করতে কোন পিতা-মাতার নাম দিবে? আসল পিতা-মাতাকে খুঁজে পেতে কষ্টসাধ্য। এখন করণীয় কী?

-আলমগীর হোসেন
গুরুদাশপুর, নাটোর।

উত্তর : শরীআতের বিধান অনুযায়ী সন্তান তার পিতা-মাতার নামেই পরিচিত হবে। পিতা-মাতার পরিচয় জানা না গেলে তার লালন-পালনকারীরা হবে তার দ্বীনী ভাই। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু’ (আল-আহযাব, ৩৩/৫)। উল্লেখ্য যে, জেনেশুনে নিজ পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পিতা-মাতা হিসাবে ডাকা যাবে না এবং সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতার স্থানে তাদের নাম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তাতে আপন পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা হবে এবং অন্যকে আপন পিতা-মাতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যার ফলাফল জাহান্নাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম’ (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৩; মিশকাত, হা/৩৩১৪)। অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ (তিরমিযী, হা/২১২১)। এমতাবস্থায় সে সকল ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতাকে পাওয়া যায় না তাদের আইডি বা পরিচয়পত্রে তাদের লালন-পালনকারীদেরকে অভিভাবক হিসাবে পরিচয় দেবে।

প্রশ্ন (৩৪) : স্বামীর উপার্জন কত, তা স্ত্রী জানে না; আর তিনিও স্ত্রীকে জানান না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার উপার্জন সম্পর্কে জানতে চায় আর স্বামী যদি সঠিক হিসাব না দেয়, তাহলে কি স্বামী পাপী হবে?

-ফরিদুল ইসলাম।
যশোর সদর।

উত্তর : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব হলো তার ভরণপোষণ থেকে শুরু করে সকল বৈধ চাহিদা সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করা। অর্থাৎ স্বামী যা আহার করবে, যে মানের পরিধান করবে, যে মানের ঘরে বসবাস করবে স্ত্রীকেও তা প্রদান করবে। স্বামীর উপার্জন কত তা স্ত্রীকে জানানো জরুরী নয়। তবে যদি কোনো প্রয়োজনে জানাতে হয় তাহলে সঠিক তথ্য জানানো উচিত। অবশ্য সত্য তথ্য জানানোর ফলে যদি সংসারে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্য গোপন রেখে কৌশলগত পথ অবলম্বন করাতে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। উম্মু কুলসুম বিনতে উক্ববা ইবনু আবী মুআয়ত রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, ‘সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখোরি করে (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৫; মিশকাত, হা/৫০৩১)। ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি। ১. যুদ্ধক্ষেত্রে, ২. লোকদের মাঝে আপস-মীমাংসার জন্য এবং ৩. স্ত্রী-স্বামী পরস্পরের নিকট (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৯২১; মিশকাত, হা/৫০৩১-৩৩)। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি স্বামীর উপার্জন হালাল না-কি হারাম সে সম্পর্কে জানতে চায় আর স্বামী যদি তা প্রকাশ না করে হারাম পথে উপার্জন করতে থাকে তাহলে স্বামীই পাপী হবে, স্ত্রী নয়।

পারিবারিক বিধান→ বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩৫) : আমার বিয়ে হয়েছে হানাফী পরিবারের এক মেয়ের সাথে। বিয়ের দিন বিয়ে পড়ানো নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী মেয়ের বাবাকে বিয়ে পড়াতে হবে। কিন্তু তাতে মেয়ের নানা, মামা, খালুরা নারায। অনেক চেষ্টা

করে বুঝিয়েও তাদের মানাতে পারিনি। তারপর এক রকম বাধ্য হয়েই আমার চাচা মেয়ের বাবার সম্মতিক্রমে তার উপস্থিতিতে সাক্ষীসমেত আমার বিয়ে পড়ান। এখন বিয়েটা কি সম্পূর্ণ হয়েছে, না-কি মেয়ের বাবাকেই পড়াতে হবে?

-মুস্তাকিম বিল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর সুন্নাতী পদ্ধতি হলো, প্রথমে বিবাহের খুৎবা হবে। অতঃপর মেয়ের সম্মতিক্রমে দু'জন সাক্ষীর সামনে মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বলবে, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। আর ছেলে বলবে, আমি কবুল করলাম। তবে প্রশ্নোল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত বিবাহ বৈধ হবে। কেননা মেয়ের বাবাকেই বিবাহ পড়াতে হবে এমনটি শর্ত নয়, বরং তার অনুমতিই যথেষ্ট। তার অনুমতি থাকলে অন্য কেউ বিবাহ পড়াতে পারে। কিন্তু তার সম্মতি না থাকলে সে বিবাহ যেই পড়াক না কেন তা বাতিল বলে গণ্য হবে (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১; আহমাদ, হা/১৯৭৪৬)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোনো নারী তার ওলীর (অভিভাবকের) অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে; তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল' (আবূ দাঊদ, হা/৩০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৪০)।

প্রশ্ন (৩৬) : জন্মের সময় মা অসুস্থ থাকায় যে শিশু (একবার) তার মামীর দুধ পান করেছে, সে কি তার মামাতো বোনকে বিবাহ করতে পারবে?

-আব্দুল্লাহ
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এমতাবস্থায় মামাতে বোনকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা সে তার দুধ বোন। আর দুধ বোনের সাথে বিবাহ হলে সে বিবাহকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন। উক্ববা ইবনু হারিস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহ্ইয়া বিনতে আবূ ইহাবকে বিবাহ করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। বিষয়টি আবার তার নিকট উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, এ বিয়ে হয় কী করে? সে তো দাবি করছে যে, তোমাদের দু'জনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে (উক্ববাকে) তার (উম্মু ইহাবের) সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে বললেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫৯)।

প্রশ্ন (৩৭) : আমাদের সমাজে কোনো মেয়ের বিয়ে হলে বাধ্যতামূলকভাবে ২০ কেজি খাগড়ায়/বাতাসা দিতে হয়। সমাজের ৮৪টি পরিবারের সবাইকে যে কোনো একদিন দুপুরে ভাত, মাছ, আলুঘন্ট ও ডাল দিয়ে খেতে দিতে হয়। যদি কোনো ছেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাহলে তাকেও ঐ নিয়ম মানতে হয়। সমাজে প্রচলিত এই প্রথার শারঈ কোনো অনুমোদন আছে কি?

-মতীউর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর : প্রথমত, ইসলামে বিয়ে উপলক্ষ্যে অলীমা অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান বা আয়োজন করা বৈধ্য নয়। বর্তমানে বিয়েকে উপলক্ষ্য করে অলীমা অনুষ্ঠান ব্যতীত গায়ে হলুদের নামে নষ্টামি, বরপক্ষ মেয়ের বাড়িতে জোরপূর্বক লোক চুক্তি করে খাবার আয়োজন করানো, অপ্রয়োজনীয় আলোকশয্যা, শোডাউন ইত্যাদির সবই ইসলাম পরিপন্থী গর্হিত কাজ। তাই এসব অবশ্যই বর্জন করতে হবে। তবে বর-কনেকে সাজানোর জন্য রং বা হলুদ দিয়ে গোসল করানো যেতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৫৫)। এ ক্ষেত্রে কোনো অপচয় করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অলীমা অনুষ্ঠান ছেলের পক্ষ হতে তার সামর্থ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে; মেয়ের পক্ষ হতে নয়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে বিয়েতে মোহর থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ ছেলে পক্ষকে বহন করতে হবে। বিয়েতে মেয়ে পক্ষের কোনো খরচ করার বিধান ইসলামে নেই। চাপিয়ে দিয়ে তো আরো নয়। প্রশ্নোল্লিখিত বিবরণে মেয়ে পক্ষ ২০ কেজি খাগড়ায় প্রদান, ৮৪টি পরিবারকে দুপুরে খাদ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতাসহ আরো যে সকল সামাজিক প্রথার প্রচলন রয়েছে তার সবই ইসলাম বিরোধী এবং অবশ্যই তা যুলম। সুতরাং এগুলোর সবকিছুই একান্ত বর্জনীয়।

পারিবারিক বিধান→ মোহরানা

প্রশ্ন (৩৮) : আমার বিয়ের মোহরানা এক লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা আমি এখনো পরিশোধ করতে পারিনি। এমতাবস্থায় যদি আমি মারা যাই তবে কি পাপ হবে?

-মাহফুজ বিন আব্দুল গফুর
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : মোহর মোটা অংকের নির্ধারণ হওয়া শর্ত নয়। বরং মোহর নির্ধারিত হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। সুতরাং সামার্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ স্বেচ্ছায় স্ত্রীর মোহর পরিশোধ না করে তাহলে অবশ্যই তার পাপ হবে। কেননা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ স্বামীর জন্য বৈধ হওয়ার এটিই একমাত্র মাধ্যম। তাছাড়া মোহর স্ত্রীর

হক্ব, যা অবধারিতভাবে আদায় বা পরিশোধ করতে হবে। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা খুশী মনে স্ত্রীর মোহর আদায় করে দাও’ (আন-নিসা, ৪/৪)। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘শর্তসমূহের মধ্যে যা পূরণ করার বেশি দাবি রাখে তা হলো সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছো’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৭২১; আবূ দাঊদ, হা/২১৩৯; তিরমিযী, হা/১১২৭; মিশকাত, হা/৩১৪৩)। সুতরাং প্রশ্নেল্লিখিত অবস্থায় স্বামী নিজেই স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তিনি মারা গেলে তার অর্থ-সম্পদ থেকে পরিশোধ করবে। নইলে তার উত্তরাধিকারীরা তা পরিশোধ করবে। কোনোটাই বাস্তবায়ন না হলে বিচারের মাঠে তার নেকী দিয়ে স্ত্রীর মোহর পূর্ণ করা হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর কিছু ছাড় দেওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি তারা খুশী মনে মোহরানার কিছু অংশ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা ভোগ করো’ (আন-নিসা, ৪/৪)।

পারিবারিক বিধান→ মীরাছ বণ্টন

প্রশ্ন (৩৯) : আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আমি জীবদ্দশায় আমার টাকা-পয়সা এই দুই ছেলে-মেয়েকে ভাগ করে দিতে পারব কি? পারলে কীভাবে ভাগ করে দিব?

-সামসুদা বেগম
খুলনা সদর।

উত্তর : মালিকের জীবদ্দশায় ওয়ারিছদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া উচিত নয়। কারণ- ১. মৃত্যুর পরেই মীরাছ বণ্টন করা আল্লাহর বিধান (আন-নিসা, ৪/৭)। ২. হয়তো তার নতুনভাবে সন্তান হতে পারে। তখন সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। ৩. সন্তানদের কেউ হয়তো পিতার পূর্বেই মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সে মীরাছের হক্বদার না হওয়া সত্ত্বেও সে সম্পদ পেয়ে যাচ্ছে। ৪. সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার পর অসুস্থতা কিংবা দান-ছাদাক্বা করার জন্য তার নিজেরই হয়তো সেই সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে। ৫. সম্পদ পেয়ে সন্তানরা হয়তো পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা করতে পারে। এছাড়াও আরো বহুবিধ সমস্যা দাঁড়াতে পারে। তাই আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে ধন-সম্পদ নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই উচিত (ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব, ফতওয়া নং ১৯২০৩৩)। তবে কেউ চাইলে অংশহারে সম্পদ বণ্টন করে যেতে পারে। নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-এর পিতা তাকে একটি গোলাম দান করলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে বলেন, ‘তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এমন গোলাম দিয়েছো?’ (বুখারী, হা/২৫৮৬; মুসলিম, হা/১৬২৩)। কিন্তু তা মীরাছ হিসাবে নয়, বরং দান হিসাবে ধর্তব্য হবে। কারণ মৃত্যুর পরই তার নাম মীরাছ হয় (আন-নিসা, ৪/৭)।

প্রশ্ন (৪০) : দাদার আগে পিতা মারা গেলে নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পদের ভাগ না পাওয়ার কারণ কী?

-রাশিদুল ইসলাম আওলাদ
হাতিবান্ধা, লালমণিরহাট।

উত্তর : প্রতিটি মানুষের একথা জেনে রাখা জরুরী যে, আল্লাহর প্রতিটি বিধানের পিছনে রয়েছে সামগ্রিক কল্যাণ ও অসীম প্রজ্ঞা। কখনো আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি, কখনো তা বুঝতে পারি না। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধানকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে প্রত্যেক মুসলিম বাধ্য (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)। মীরাছের ক্ষেত্রে শরীআতের মূলনীতি হলো ‘জীবিত নিকটবর্তী ওয়ারিছগণ মীরাছের হক্বদার হবে’। তাই দাদার আগে পিতা মারা গেলে চাচাদের উপস্থিতিতে নাতি-নাতনিরা মীরাছের হক্বদার হয় না। এমতাবস্থায় শরীআতের একটি বিধান হলো, মালিকের পক্ষ থেকে এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত করত পারে। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তির অছিয়ত করার মতো কিছু সম্পদ রয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য তার নিজের কাছে অছিয়তনামা লিখে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭; মিশকাত, হা/৩০৭০)।

প্রশ্ন (৪১) : আমরা জানি পিতার আগে ছেলে মারা গেলে নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পদের ভাগ পায় না। কিন্তু যদি ছেলের স্ত্রী থাকে তাহলে সে কি সম্পদ পাবে?

-কামরুল হাসান
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : পুত্রবধূ তার শ্বশুরের সম্পদের ওয়ারিছ হবে না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১৬/৫০২)।

আদব-আখলাক

প্রশ্ন (৪২) : ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্ধারিত বয়স শর্ত থাকে। বেশি বয়স হলে ভর্তির সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে বয়স কমানো যাবে কি?

-রহমাতুল্লাহ
রাজশাহী।

উত্তর : বয়স কমানোর জন্য কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেননা মিথ্যা বলা বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মহাপাপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো’ (আল-হজ্জ, ২২/৩০)। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা মিথ্যাচার বর্জন করো। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়...’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৭; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৮৯; মিশকাত, হা/৪৮২৪)। তাছাড়া এভাবে বয়স কমানো

প্রতারণার শামিল, যা নিষিদ্ধ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩২; মিশকাত, হা/২৮৬০; আবূ দাঊদ, হা/৪৩৫২)। উল্লেখ্য যে, তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। তাহলো- (১) মীমাংসার জন্য (২) যুদ্ধক্ষেত্রে (৩) স্ত্রী-স্বামী পরস্পরের নিকট (আবূ দাঊদ হা/৪৯২১; মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত, হা/৫০৩১ ও ৫০৩৩)।

প্রশ্ন (৪৩) : 'সম্রাট শান উদ্দীন' নাম রাখা যাবে কি?

-রাশেদ
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সম্রাট শান উদ্দীন-এর অর্থ রাজাধিরাজ। বিধায় এ নাম রাখা যাবে না। কেননা যে সকল শব্দ বা নামের অর্থ রাজাধিরাজ তা দ্বারা মানুষের নাম রাখা নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সমীপে সবচেয়ে খারাপ নাম ঐ ব্যক্তির হবে যাকে 'মালিকুল আমলাক' তথা 'রাজাধিরাজ' বলা হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬২০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪৩; মিশকাত, হা/৪৭৫৫)।

প্রশ্ন (৪৪) : মিসওয়াক দাঁড়িয়ে করব, না-কি বসে করব?

-ইমরান হুসাইন
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : দাঁড়িয়ে কিংবা বসে মিসওয়াক করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। সুতরাং উভয় অবস্থায় মিসওয়াক করার বৈধতা রয়েছে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (ছালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৫; ইবনু মাজাহ, হা/২৮৬; আবূ দাঊদ, হা/৫৫)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, তাঁর প্রথম কাজ ছিল মিসওয়াক করা (আবূ দাঊদ, হা/৫১; মুসলিম, হা/২৫২; নাসঈ, হা/৮; ইবনু মাজাহ, হা/২৯)। হাদীছদ্বয়ে মিসওয়াক করার কথা বলা হয়েছে তবে কোনো পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। অতএব মিসওয়াককারী তার সুবিধাজনক অবস্থায় মিসওয়াক করবে।

প্রশ্ন (৪৫) : যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হবে, না-কি বসে পান করতে হবে?

-ওয়াজেদ আলী
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : যমযমের পানি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করেছেন। বসে পান করার কোনো দলীল পওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২০২৭; মিশকাত, হা/৪২৬৮)।

প্রশ্ন (৪৬) : ছেলে সন্তানের নাম আন-নাফী সোহান এবং আল-কাফী রুহান রাখা হয়েছে। নাম দু'টি রাখা যাবে কি?

-বোরজাহান আলী
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : 'আন-নাফী' আরবী শব্দ, যার অর্থ পরম উপকারকারী। এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তাই 'আন-নাফী' নাম না রেখে 'আব্দুন নাফী' রাখা ভালো। তবে শুধু নাফে' নাম রাখা যায়। কিন্তু 'সোহান' কোনো আরবী শব্দ নয়। এ নাম রাখা যাবে না। অনুরূপ 'আল-কাফী' আরবী শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী, প্রয়োজনমুক্ত, উপযোগী। তাই শুধু 'আল-কাফী' নাম না রেখে 'আব্দুল কাফী' বা 'আব্দুল্লাহিল কাফী' নাম রাখা ভালো। কিন্তু 'রুহান' কোনো অর্থপূর্ণ আরবী শব্দ নয়। এ নাম রাখা যাবে না।

আখিরাত → হাউযে কাওছার

প্রশ্ন (৪৭) : হাউযে কাওছার কীসের তৈরি এবং এর আয়তন কত?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ

উত্তর : হাউয অর্থ চৌবাচ্চা বা পানি জমা হওয়ার স্থান। আর কাওছার অর্থ প্রচুর পরিমাণ, দানবীর নেতা, অফুরন্ত নে'মত। এখানে হাউযে কাওছার হলো, জান্নাতের একটি ঝরনা। এটি প্রশস্ত গম্বুজ ও অনেক সারাইখানাবিশিষ্ট মণি-মুক্তা দ্বারা তৈরি। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝরনার কাছে এলে দেখি যে তার দু'ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা ঐ কাওছার যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। তার ঘ্রাণে অথবা মাটিতে ছিল উত্তম মানের মিশক-এর সুগন্ধি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৮১; তিরমিযী, হা/৩৩৬০)।

হাউযে কাওছারের চতুর্দিকের আয়তন প্রায় এক মাসের পথ। যার দূরত্ব ইয়ামান দেশের আদান হতে সিরিয়ার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, তার ঘ্রাণ মিশক-এর চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মতো অগণিত।

তাথেকে যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৯২; মিশকাত, হা/৫৫৬৭)। আবূ সাল্লাম বলেন, ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ইয়ামান দেশের আদান হতে সিরিয়ার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ। এর পানির রং দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা হতে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের মাথার চুল উশকোখুশকো, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীর দুলালীদের বিয়ে করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হতো না’ (তিরমিযী, হা/২৪৪৪; মিশকাত, হা/৫৫৯২)।

আখিরাত → জান্নাত-জাহান্নাম

প্রশ্ন (৪৮) : জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছুর আকার আকৃতি কেমন হবে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : জাহান্নামের সাপের আকৃতি হবে বড় ধরনের উটের মতো এবং বিচ্ছুর আকৃতি হবে খচ্চরের মতো বিরাট। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যারা জাহান্নামী হবে তাদের শাস্তির জন্য উপকরণ হিসাবে সেখানে রাখা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে আগুনের সাপ। সেই সাপের আকৃতি হলো বড় ধরনের উটের মতো। আর এই সাপ যদি একবার কোনো দোযখীকে দংশন করে তাহলে তার বিষক্রিয়া থাকবে বহু দিন পর্যন্ত এবং ক্ষত জায়গা হতে রক্ত বাহির হবে দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত। তারপরে এই সাপের ন্যায় বড় ধরনের বিচ্ছুও জাহান্নামে থাকবে প্রচুর পরিমাণে। তাদের আকৃতি হবে খচ্চরের মতো বিরাট। এরাও একবার দংশন করলে তাদের বিষক্রিয়াও থাকবে ৪০ বছর পর্যন্ত (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৬৭৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৭৪৭১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৪২৯)। অপর এক বর্ণনায় আছে, জাহান্নামের সাপ হবে অত্যন্ত বিষাক্ত ও টাকমাথাবিশিষ্ট। তার দু’চোখের উপর দু’টি কালো দাগ থাকবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে টেকোমাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার দু’চোখে দু’টি কালো বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে এবং তার দু’চোয়াল কামড়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। আমি তোমার সঞ্চিত ধন’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪)।

প্রশ্ন (৪৯) : সন্তান শৈশবকালে মারা গেলে সে তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। কিন্তু যে শিশুর পিতা-মাতা নেশাখোর সে কি তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে?

-মাহফুজ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মানুষ তার কর্মানুযায়ী জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাবে। তবে মানুষের শিশু সন্তানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ যে সকল পিতা-মাতার সন্তান শৈশবকালে মারা গেছে তাদের জন্য ঐ শিশু জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের মাঝে কেউ তার পিতার সাথে মিলিত হবে, অথবা পিতা-মাতা দু’জনের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তারা তাদের পরিধানের কাপড় বা কাপড়ের আঁচল ধরে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৫; মিশকাত, হা/১৭৫২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুসলিমের তিনটি সন্তান মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তবে কসম পুরা করার জন্য (ক্ষণিকের জন্য হলেও) প্রবেশ করানো হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১২৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩২; তিরমিযী, হা/১০৬০; নাসাঈ, হা/১৮৭৫; মিশকাত, হা/১৭২৯)। উক্ত হাদীছগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলিম পিতা-মাতা পাপী হলেও শিশু সন্তানের কারণে জান্নাতে যেতে পারে।

প্রশ্ন (৫০) : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন ছাহাবীকে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেন বা কোন কারণে ‘আশারায়ে মুবাশশারা’ হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ বা সার্টিফিকেট দিয়েছেন?

-আব্দুস সাকী আহমাদ
দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো একটি আমলের কারণে নয়, বরং তাদের ব্যাপক আমলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে অন্যান্য কিছু ছাহাবী তাদের ব্যাপক নেক আমল ছাড়াও নির্দিষ্ট কোনো আমলের কারণে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন বেলাল রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু ওযূর পর দু’রাক‘আত ‘তাহিয়্যাতুল ওযূ’-র ছালাত আদায় করার জন্য জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/৪৬৪; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২২৬; মিশকাত হা/১৩২২)।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন :

৫ হাজার ছাত্রের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক ভবন

ক্রয়াধীন ৬০০ শতক জমি

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

আল-ইতিছাম গবেষণাগার

আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

বিকাশ এজেন্ট : ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০

বিকাশ পার্সোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ ; ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
রকেট পার্সোনাল : ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ ; ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

(ঢাকার জন্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা- মিনিট
হিজরী	ঈসায়ী			
০১ রামাযান	১৪ এপ্রিল	বুধবার	০৪:২০	০৬:২০
০২ রামাযান	১৫ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪:১৯	০৬:২০
০৩ রামাযান	১৬ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪:১৮	০৬:২১
০৪ রামাযান	১৭ এপ্রিল	শনিবার	০৪:১৭	০৬:২১
০৫ রামাযান	১৮ এপ্রিল	রবিবার	০৪:১৬	০৬:২২
০৬ রামাযান	১৯ এপ্রিল	সোমবার	০৪:১৫	০৬:২২
০৭ রামাযান	২০ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪:১৪	০৬:২৩
০৮ রামাযান	২১ এপ্রিল	বুধবার	০৪:১৩	০৬:২৩
০৯ রামাযান	২২ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪:১২	০৬:২৩
১০ রামাযান	২৩ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪:১১	০৬:২৪
১১ রামাযান	২৪ এপ্রিল	শনিবার	০৪:১০	০৬:২৪
১২ রামাযান	২৫ এপ্রিল	রবিবার	০৪:০৯	০৬:২৫
১৩ রামাযান	২৬ এপ্রিল	সোমবার	০৪:০৮	০৬:২৫
১৪ রামাযান	২৭ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪:০৭	০৬:২৬
১৫ রামাযান	২৮ এপ্রিল	বুধবার	০৪:০৬	০৬:২৬
১৬ রামাযান	২৯ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪:০৫	০৬:২৭
১৭ রামাযান	৩০ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪:০৪	০৬:২৭
১৮ রামাযান	০১ মে	শনিবার	০৪:০৩	০৬:২৮
১৯ রামাযান	০২ মে	রবিবার	০৪:০২	০৬:২৮
২০ রামাযান	০৩ মে	সোমবার	০৪:০১	০৬:২৮
২১ রামাযান	০৪ মে	মঙ্গলবার	০৪:০১	০৬:২৯
২২ রামাযান	০৫ মে	বুধবার	০৪:০০	০৬:২৯
২৩ রামাযান	০৬ মে	বৃহস্পতিবার	০৩:৫৯	০৬:৩০
২৪ রামাযান	০৭ মে	শুক্রবার	০৩:৫৮	০৬:৩০
২৫ রামাযান	০৮ মে	শনিবার	০৩:৫৭	০৬:৩১
২৬ রামাযান	০৯ মে	রবিবার	০৩:৫৭	০৬:৩২
২৭ রামাযান	১০ মে	সোমবার	০৩:৫৬	০৬:৩২
২৮ রামাযান	১১ মে	মঙ্গলবার	০৩:৫৫	০৬:৩২
২৯ রামাযান	১২ মে	বুধবার	০৩:৫৪	০৬:৩৩
৩০ রামাযান	১৩ মে	বৃহস্পতিবার	০৩:৫৪	০৬:৩৩

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Sciences,Karachi.

হিজরী : ১৪৪২, ঈসায়ী : ২০২১, বঙ্গীয় : ১৪২৮

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	+১	-১	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-৩	-১	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-২	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-২	-৫	-৫	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৫	-৯	-৯	-৯
নোয়াখালী	-১	-৪	-৪	-৪
চাঁদপুর	০	-২	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	০	-৩	-৩	-৩
চট্টগ্রাম	-৩	-৭	-৮	-৮
কক্সবাজার	-২	-৯	-৯	-১০
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৮	-৮
বান্দরবান	-৪	-৯	-৯	-১০

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৮	-৫	-৫	-৪
মৌলভীবাজার	-৭	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৩	-৩	-৩
সুনামগঞ্জ	-৭	-২	-২	-২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	-১	+৩	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	-২	+১	+১	+২
জামালপুর	-১	+৩	+৪	+৪
নেত্রকোণা	-৪	০	০	+১

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৫	+৬	+৬
রাজশাহী	+৬	+৮	+৮	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৭	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১০	+১০
নওগাঁ	+৪	+৭	+৭	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৮	+৪	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২
বাগেরহাট	+৫	+১	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+২	+১০	+১১	+১২
দিনাজপুর	+৩	+৯	+১০	+১০
লালমনিরহাট	-১	+৭	+৭	+৭
নীলফামারী	+২	+৯	+৯	+১০
গাইবান্ধা	০	+৫	+৫	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৩	+১০	+১১	+১২
রংপুর	০	+৭	+৭	+৮
কুড়িগ্রাম	-১	+৬	+৬	+৬

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+৩	০	-১	-১
পটুয়াখালী	+৩	-১	-২	-২
পিরোজপুর	+৪	+১	০	০
বরিশাল	+২	-১	-১	-২
ভোলা	+১	-২	-৩	-৩
বরগুনা	+৪	-১	-১	-২

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'

(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রিতে তারাবীহর ছালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'

(ছহীহ বুখারী, হা/৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৯)।